তিন গোয়েন্দা

স্বর্গদ্বীপ

রকিব হাসান

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro

জিনাকে উদ্ধার করতে ফ্লোরিডার
গাল আইল্যান্ডে চলল তিন গোয়েন্দা।
চড়ছে তাপমাত্রা,
বাড়ছে বিপদ।
তেড়ে এল কুকুর,
ফুঁসে উঠল অ্যালিগেটর,
যুক্ত হলো হাঙর।
মারাত্মক ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে পড়ে
হাবুডুবু খেতে লাগল ওরা…

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

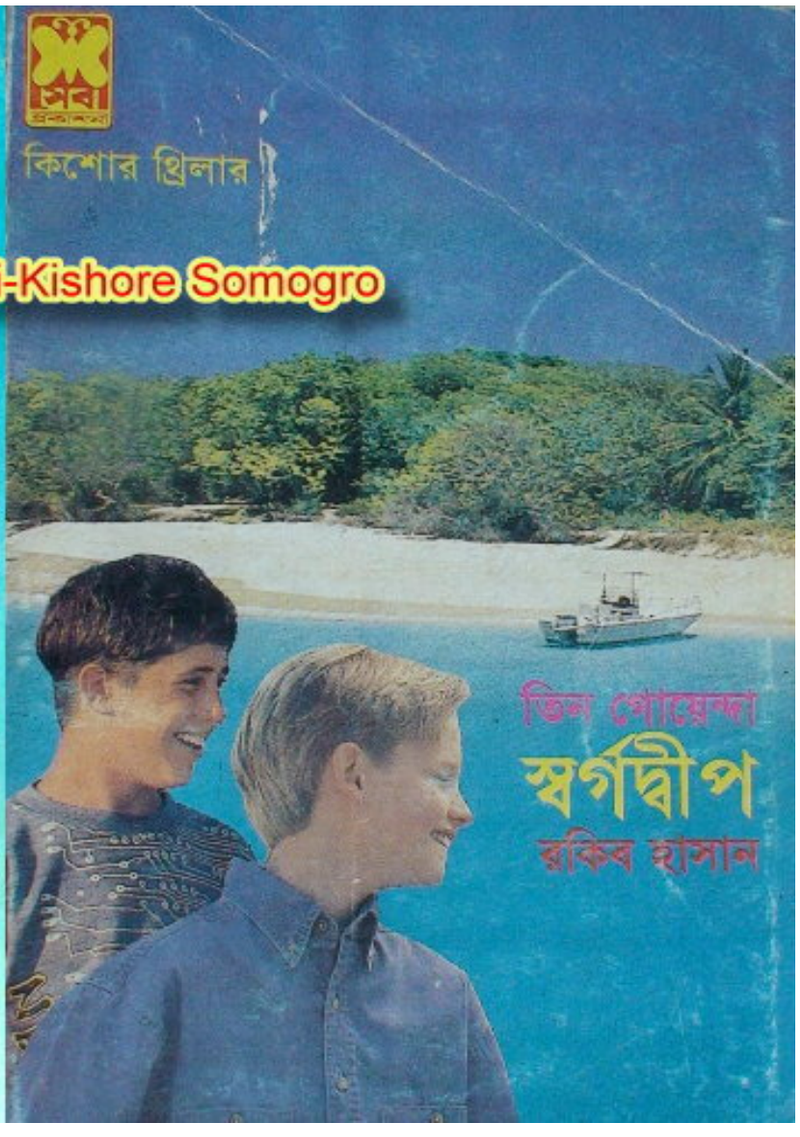

স্বর্গদ্বীপ

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

উজ্জ্বল নিওন আলোয় লেখা 'ওয়েলকাম টু নর্থ ক্যারোলিনা!' সাইনটা যখন চোখে পড়ল ওদের, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে তখন।

'খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার,' ঘোষণা করল মুসা। দুই হাত স্টিয়ারিঙে। চোখ সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। 'না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে জিনার কোন উপকার করতে পারব না।'

ম্যাপ দেখে রবিন জানাল, 'সামনে আর মাইল দশেক গেলেই খাবার পাওয়া যাবে।'

'দারুণ!' বলল উচ্ছ্বসিত মুসা। 'সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খবরটা দিলে। গাড়িটারও পেট্রল দরকার। আমাদেরও পেট্রল দরকার।'

'ক'টা বাজে?' হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। দু'হাত টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

'নাস্তার সময় হয়ে গেছে,' মুসা জানাল। 'ঘুমিয়ে গেছিলে তো, তাই জানো না। তোমাদের দু'জনকেই একটা সংবাদ দিই। ভার্জিনিয়া থেকেই আমাদের অনুসরণ করে আসছে একটা ট্রাক।'

'নাম্বার দেখেছ?' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। মুহূর্তে ঘুম উধাও হয়ে গেল চোখ থেকে।

'না,' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা। 'বেশি দূরে। দেখা যাচ্ছে না।'

মাথাটা সামান্য উঁচু করে সাবধানে তাকাল পেছনে বসা রবিন। 'আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে আমাদের মতই সে-ও ফ্লোরিডা থেকেই আসছে। কাকতালীয় ব্যাপার।'

'উঁহু,' মুসা মানতে চাইল না। 'আমি গতি বাড়ালেই সে-ও বাড়ায়, কমালে কমায়। অনুসরণ যদি না করে থাকে, তাহলে কি খেলছে আমাদের সঙ্গে?'

এক্সিট র‍্যাম্পের শেষ মাথায় এসে একটা গ্যাস স্টেশনে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মুসা। পাম্পের লাগোয়া একটা বড় রেস্টুরেন্ট। খামারবাড়ির মত চেহারা। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তেল ভরতে লাগল কিশোর। মুসা আর রবিন নজর রাখল রাস্তার দিকে।

'ওই যে,' মুসা বলল।

গ্যাস স্টেশনের পাশ দিয়ে দ্রুত সরে গেল ট্রাকটা। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ওটাকে।

'লোক তো মনে হলো দু'জন, তাই না?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'কিন্তু গতি তো কমাল না একবিন্দু। তারমানে

আমারই ভুল ছিল। আমাদের অনুসরণ করেনি ওরা।'

তেল ভরা শেষ করে রেস্টুরেন্টের সামনে এনে গাড়িটা রাখল ওরা। তারপর রেস্টুরেন্টে ঢুকল। একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল। রাত দুটো বাজে। কিন্তু এখনও টিন-এজ ওয়েইট্রেসের মুখের হাসি মলিন হয়নি। হাসিমুখে স্বাগত জানাল ওদের। কথায় দক্ষিণাঞ্চলীয় টান। একটা করে মেন্যু তুলে দিল প্রত্যেকের হাতে।

'ডিনার পাওয়া যাবে এত রাতে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যাবে,' হাসিটা উজ্জ্বল হলো আরও। 'দিনে-রাতে যখন খুশি যে কোন খাবার চাও, দিতে পারব আমরা।'

'তাই নাকি!' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।

খাবারের অর্ডার দেয়া হলো। এনে দিল ওয়েইট্রেস। নীরবে খেয়ে চলল ওরা। রাত জেগে, একটানা গাড়িতে বসে থেকে ক্লান্ত। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। খাওয়া শেষ করে বিল দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

'ভাবছি,' গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর, 'আমাদের ট্রাকের বন্ধুরা না এসে হাজির হয় আবার এখন।'

'চলেই তো গেল,' জবাব দিল রবিন। 'আর আসবে কি?'

সে আর মুসা আগে আগে হাঁটছে।

'খাইছে!' বলে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল মুসা।

দু'জনে তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে।

কি দেখে থমকাল ওরা, পেছনে থাকায় বুঝতে পারল না প্রথমে কিশোর। তারপর লক্ষ করল, স্বাভাবিকের তুলনায় নিচু হয়ে আছে গাড়িটার ছাত। এর কারণ, চার চাকার রিমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এখন ওটা। চারটে টায়ারই কেটে ফালা ফালা করে দেয়া হয়েছে।

কাটা রবারগুলোর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এরজন্যে পস্তাতে হবে ওদের!'

'পস্তানো তো পরে,' কিশোর বলল। 'আগে ওদের নাগাল তো পেতে হবে। তার জন্যে গাড়িটা সচল করা দরকার। রাস্তার ধারে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা চাকা মেরামতের দোকান দেখেছি। দেখি, চারটে টায়ারের জন্যে কি পরিমাণ খসায় পকেট থেকে।'

'চার নয়, পাঁচটা,' শুধরে দিল মুসা। 'বাড়তি চাকাটাও খতম করে দিয়ে গেছে। ওই দেখো।' ভ্যানের পেছনে দরজার ফ্রেমে আটকে রাখা চাকাটা দেখাল সে। 'কিন্তু কে করল শয়তানিটা?'

'রাত দুপুরে রসিকতা করতে আসেনি কেউ,' কিশোর বলল। 'ইচ্ছে করে করেছে। ভয় দেখিয়ে আমাদের রকি বীচে ফেরত পাঠানোর জন্যে।'

'সামান্য কয়খান চাকা কেটে আমাদের ফেরত পাঠাবে?' ভুরু নাচাল রবিন। 'জিনাকে না নিয়ে ফেরত যাচ্ছি না আমরা, এটা ওদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার।'

'সময় হলে আপনি বুঝবে,' কিশোর বলল।

শ'তিনেক ডলার আর পঁয়তাল্লিশটা মিনিট গচ্চা দিয়ে আবার এসে রাস্তায় নামল ওরা। ভোর রাতের নীরবতা। ঘুমন্ত পরিবেশ। কিন্তু ওদের চোখে ঘুম

নেই।

'কখন যে গিয়ে পৌঁছাতে পারব,' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল মুসা।

ম্যাপ দেখে বলল রবিন, 'আরও তিনশো মাইল গেলে পাওয়া যাবে ফ্লোরিডার সীমান্ত।'

'তারপর? ফ্লোরিডা থেকে গাল আইল্যান্ড?'

'আজ রাত ন'টা-দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব,' রবিন বলল। 'বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে দারুণ হবে জায়গাটা। গাল আইল্যান্ড, লোকসংখ্যা পাঁচশো সাঁইত্রিশ,' গাড়িটা যেখান থেকে ভাড়া নিয়েছে, তারা একটা ছোট বই দিয়েছে। তথ্যগুলো লেখা আছে তাতে। 'ফ্লোরিডার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, সারাসোটা আর নেপল্‌সের মাঝামাঝি। বোটে করে যাওয়া যায়, আবার গাড়ি নিয়েও যাওয়া যায়। গাড়িতে করে যেতে হলে সীভিউ থেকে ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের ভেতর দিয়ে আইল্যান্ড কজওয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে চমৎকার একটা সাদা বালির সৈকত আছে...'

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দেখো তো, ওয়াইল্ড পাম মোটেলটার কথা লেখা আছে নাকি?'

'আছে,' ট্র্যাভেল বুকের পাতা উল্টে দেখে বলল রবিন। 'দ্বীপের উত্তর প্রান্তে। বলছে প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর ওখানকার। থাকার জন্যে বিশটা আধুনিক কটেজ আছে, এয়ারকন্ডিশনার আর টিভি সহ। সৈকতের কাছে। মার্কেটিং সুবিধা আর নাইটলাইফ সহ।'

'এই নাইটলাইফটা কি জিনিস?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল রবিন। 'গেলেই বোঝা যাবে। তবে রাতের বিনোদনের কথাই বলেছে হয়তো, সেটারই নাম দিয়েছে নাইটলাইফ।'

পাক্কা তিরিশটা ঘণ্টা রাস্তায় কাটিয়ে অবশেষে সরু আইল্যান্ড কজওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

'নাইটলাইফের তো কিছুই দেখছি না,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর।

'ওই যে নাইটলাইফ,' হাত তুলে সামনের বাড়িটা দেখাল মুসা। 'কুপার'স ডিনার। এখনও খোলা।'

কিশোর আর রবিন দু'জনেই হাসল। তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। পুরানো ঢঙে তৈরি বাড়ি, সাদা রঙ করা। দ্বীপের মেইন স্ট্রীটের নাম কারলু রোড। এই রোডের পাশে কজওয়ের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।

'নাইটলাইফ বটে,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'ওই যে, আমরা যেটা খুঁজছি,' গাল আইল্যান্ড মেরিনার দিকে হাত তুলল রবিন। সাইনবোর্ডে লেখা: ওয়াইল্ড পাম মোটেল। চার মাইল।

'মুসা, ডানে ঘোরো,' বলল সে।

'সাংঘাতিক ঝড় হয়ে গেছে এখানে,' বিধ্বস্ত গাছপালাগুলো দেখে বলল মুসা। ভেঙে এসে রাস্তায় পড়ে আছে কিছু নারকেল আর পাম গাছ। সে-সব

এড়িয়ে সাবধানে চালাতে হচ্ছে তাকে।

'দিনের আলোয় নিশ্চয় অন্য রকম লাগবে,' হতাশ মনে হলো রবিনকে। 'এখন তো একেবারে বিবর্ণ!'

শুধু বিবর্ণই নয়, রুক্ষও লাগছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। বাড়িঘরও তেমন দেখা যাচ্ছে না এদিকটাতে।

'সত্যি কথা বলব?' মুসা বলল। 'সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও দেখছি না আমি। বরং ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দেখলে মনে হয় কাজ করতে করতে কিসের আশঙ্কায় যেন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উন্নয়ন। দেখছ না কেমন আধখাপচা তৈরি হয়ে পড়ে আছে বাড়িগুলো?'

'যা-ই বলো,' কিশোর বলল, 'এতটা খারাপ কিন্তু না। আমি তো কার্ড তৈরি করার উপযোগী প্রচুর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।'

কথাটা ভুল বলেনি সে। গাছপালার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে, কিন্তু এখনও প্রচুর গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে–ছবির মত করে সাজানো, তার ওপাশে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে গালফ অভ মেক্সিকো।

'যাক, এলাম শেষ পর্যন্ত,' শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। পুরো আধপাক গাড়ি ঘুরিয়ে মোড় নিল। পাশ দিয়ে চলে গেল গোলাপী নিওন আলোয় লেখা 'ভ্যাকেন্সি' সাইন। গাড়ি থামাল এনে ওয়াইল্ড পাম মোটেলের অফিসের সামনে।

'ওয়াইল্ড পাম কেন নাম রাখা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে,' হোটেলের সীমানার মধ্যে জন্মানো উঁচু উঁচু পামের জটলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। প্রচুর গাছ।

'জেগেই আছে মনে হয়,' আলোকিত অফিসের দিকে তাকিয়ে থেকে ইমার্জেন্সি ব্রেকটা লাগিয়ে দিল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। হাত-পা টান টান করে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার আড়ষ্টতা কাটাতে চাইল। নামার সময় হয়েছে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় তার পাশের দরজাটা খুলে ফেলে লাফ দিয়ে নেমে দিল দৌড় মুসা।

দুই

কিশোরও দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে মুসার পেছনে ছুটল। অফিসের পেছনের ঘন ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে মুসা।

'মুসা!' দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ঝোপের অন্ধকারে মুসাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাল তার চোখ।

জবাব দিল না মুসা।

'মুসা!' আবার ডাকল সে।

আচমকা হুড়মুড় করে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল

মুসা।

'অফিসের পেছনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল একটা লোক,' কোনখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল হাত তুলে দেখাল সে। 'আমাদের দেখে দৌড় মারল।'

চেঁচামেচি শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা এক ভদ্রলোক। বয়েস প্রায় ষাট। ছোট করে ছাঁটা ধূসর রঙের দাড়ি। অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পেছনে বেরোল কিশোরদের বয়েসী এক কিশোরী।

'হালো,' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, 'এসেছ তাহলে। তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল কিশোর। পেছনে এল মুসা।

'আমি জেরাল্ড গ্লেজব্রুক,' হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। 'ইভা তো তোমাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।'

'কতদিন পর দেখা! কেমন আছ তোমরা, কিশোর?' এগিয়ে এল মেয়েটা। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। সুন্দরী। লাল চুলগুলো মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে।

'চাচা, ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিল ইভা। 'আর ও মুসা, মুসা আমান।...আর এই যে, রবিন।'

গাড়ি থেকে নেমে চলে এসেছে রবিনও। কিশোরের কাছ থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'খুব খুশি হলাম তোমাদের দেখে,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্রুক। 'এই খানিক আগেও তোমার বাবা ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন তোমরা এসেছ নাকি,' রবিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'ইভা তো তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমাদের মত গোয়েন্দা নাকি আর সারা দুনিয়ায় নেই।'

'বাড়িয়ে বলেছে,' হাসল কিশোর। 'বন্ধু তো।' প্রশংসা করা কথাবার্তা বিব্রত করে ওকে, তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, 'যাই হোক, আপনাদের চমকে দিতে চাই না। তবু বলতেই হচ্ছে, আপনাদের পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা লোক। আপনারা কোন শব্দটব্দ শুনেছেন? অস্বাভাবিক কিছু?'

ইভার সবুজ চোখের তারায় শংকা দেখতে পেল কিশোর।

'না! দেখিনি!' হঠাৎ রেগে গেলেন মিস্টার ব্রুক। 'তাই তো বলি! আমি আরও ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না কেন আজ? এসো, ভেতরে এসো। সব বলছি তোমাদের।'

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ফরমিকার কাউন্টার থেকে শুরু করে লাল প্লাস্টিকের চেয়ার আর অন্যান্য আসবাবপত্র সব কিছুতে ধুলো পড়ে আছে। মলিন হয়ে গেছে চেহারা, লক্ষ করল কিশোর। যত্ন নেয়া হয় না বোঝা যায়। যেন কোন কারণে ওগুলোর প্রতি একটা অনীহা জন্মে গেছে মালিকের।

'পেছনে আমার বেডরুম,' পর্দা ঝোলানো একটা দরজা দেখালেন মিস্টার ব্রুক। 'ইভারটা তার পাশে।'

কাউন্টারের পেছনে সারি সারি নম্বর। প্রতিটি নম্বরের ওপরে হুক। চাবি

ঝুলছে ওগুলো থেকে।

'সুন্দর একটা রিসর্ট ছিল এটা,' দুঃখের সঙ্গে জানালেন মিস্টার ব্রুক। ফলের হালুয়া কাটতে চাচাকে সাহায্য করল ইভা। এটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিশোরদের আসার শব্দ শুনে কাজ রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গিয়েছিল দু'জনে। 'প্রচুর ট্যুরিস্ট আসত। ভালই ছিলাম আমরা। কিন্তু দুর্ঘটনাটাও ঘটল, আমরাও গেলাম।'

চাচার সঙ্গে সুর মেলাল ইভা, 'চাচার ডকটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে হলুদ রেসিং বোটটা।'

'দু'জন ট্যুরিস্ট রোদ পোয়াচ্ছিল, এই সময় এসে গুঁতো মারল বোটটা।' ফুঁসে উঠলেন মিস্টার ব্রুক। 'দু'জনকেই হাসপাতালে নিতে হয়েছে।'

'বোট চালকের কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওর আর কি হবে?' বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন মিস্টার ব্রুক। 'প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে অ্যাক্সিডেন্টের পর পরই ফুল স্পীডে পালিয়ে গেছে সে। তার মানে ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়ে গেছে ডকটা। পুলিশ পরে জানতে পেরেছে বোটটা নাকি চোরাই বোট ছিল। চোরটাকে ধরতে পারেনি। বোটটাও নাকি আর খুঁজে পায়নি। পুলিশের ধারণা, ডকে বাড়ি লেগে বোটটারও ক্ষতি হয়েছিল। ফেটে-টেটে গিয়েছিল নিচের দিকে। পানি ঢুকে ডুবে গেছে চ্যানেলে। চোরটাও মরেছে পানিতে ডুবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ঘটনাটা কি জিনার নিখোঁজ হওয়ার আগের?' জানতে চাইল কিশোর।

'আগের দিনের,' ইভা জানাল।

'জিনা কি করে নিখোঁজ হলো, খুলে বলবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'বলব না কেন? বলার জন্যেই তো তোমাদের ডেকে আনলাম,' ইভা বলল।

গাল আইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে জিনার রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হওয়ার খবরটা মুসাদের বাড়িতে ফোন করে ইভাই জানিয়েছিল। মুসা গিয়ে খবর দিয়েছে কিশোর আর রবিনকে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে সেদিনই রকি বীচ থেকে গাল আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তিনজনে।

খুক করে কাশল ইভা। জিজ্ঞেস করল, 'খাবে কিছু?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, আমরা খেয়ে এসেছি। তুমি বলো।'

'জিনা এখানে বেড়াতে আসার পর থেকে রোজই আমরা একসঙ্গে সৈকতে বেড়াতে যেতাম। সেদিন আমার কিছু জরুরী কাজ ছিল অফিসে। চাচাকে সাহায্য করতে হয়েছিল। জিনাকে বললাম সৈকতে চলে যেতে। আমি পরে যাব।

'লাঞ্চের পর খাবার নিয়ে গেলাম সৈকতে। আমাদের বসার প্রিয় জায়গাগুলোতে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না তাকে। ভাবলাম, শহরে-টহরে গেছে। চলে আসবে।

'আমি অপেক্ষা করতেই থাকলাম। কিন্তু সে আর আসে না। চাচার গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মোটেলে ফিরে এলাম। চাচাকে বললাম সব। তখনও খারাপ কিছু সন্দেহ করিনি আমরা।

'সন্ধ্যার পরেও যখন ফিরল না, ভীষণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে খোঁজ নিল চাচা। আমিও কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। কোথাও

যায়নি জিনা।'

একটানা কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল ইভা।

'গেকো গাড়িটা পরে খুঁজে পেয়েছে পেলিক্যান লেন-এ,' মিস্টার ব্রুক জানালেন, 'পরিত্যক্ত অবস্থায়।'

'গেকো!' চোখের পাতা সরু করে ফেলল মুসা। 'গেকো তো জানি এক ধরনের গিরগিটি?'

'আরে না না, এ গেকো সে গেকো নয়,' না হেসে পারলেন না মিস্টার ব্রুক। 'এর পুরো নাম হেরিং গেকো। ডেপুটি শেরিফ। আমাদের এখানকার পুলিশ ফোর্স। ওই একজনের ওপরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরো দ্বীপ দেখাশোনার। যাই হোক, আঙুলের ছাপটাপ খোঁজাখুঁজি করেছে সে। পেয়েছে তিনজনের। আমার, জিনার আর গাড়ির গ্যারেজের মিস্ত্রির।'

'মাত্র একজন পুলিশ?' বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। 'আস্ত একটা দ্বীপের দেখাশোনার জন্যে মাত্র একজন?'

'হ্যাঁ,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'অথচ দেখো, সীভিউর কাউন্টি কর্তৃপক্ষ পাশের দ্বীপ ক্যাসটেলো কী-কে দিয়েছে পাঁচজন পুলিশ। আর আমাদের মাত্র একজন। বড় বেশি পক্ষপাতিত্ব!'

'তা, আপনাদের গেকো সাহেব কোন সূত্রটুত্র পেয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কিচ্ছু না,' জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'গাড়িটা রেখেছি অফিসের পেছনে। তোমরা ইচ্ছে করলে ওটাতে সূত্র পড়ে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারো। তার জন্যে গাড়িটাকে টুকরো টুকরোও যদি করে ফেলতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'জিনাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে টাকার জন্যে নোট পাঠিয়েছে? কিংবা ফোন-টোন কোন কিছু?'

'কিছুই পাঠায়নি। পাঠিয়ে লাভ হবে না, জানে। আমার তো টাকা-পয়সা নেই যে দিতে পারব। শুধু কি কিডন্যাপিং; চুরি-দারি আরও কত কিছুই করছে। এই তো, জিনা নিখোঁজ হওয়ার তিন রাত আগে আমার দুটো পাম গাছ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'পাম গাছ! গাছ চুরি করে কার কি লাভ?'

'ফ্লোরিডায় কিছুদিন ধরে পামের এক ধরনের রোগ হচ্ছে, পাম-ফাঙ্গাস বলে এক জাতের ফাঙ্গাস ধ্বংস করে দিচ্ছে গাছগুলোকে,' মিস্টার ব্রুক জানালেন। 'কাজেই এ সব গাছের এখন খুব কদর এ অঞ্চলে। সুস্থ গাছ পেলে ভাল দাম দিতে রাজি আছে অনেকে।'

'মজার ব্যাপার হলো,' ইভা বলল, 'এত নিঃশব্দে কাজটা করেছে ওরা, রাতের বেলা কোন শব্দই শুনিনি আমরা। এমনকি গাছগুলো যে গায়েব হয়ে গেছে পরদিন সকালেও খেয়াল করিনি আমি। মাটিতে গর্ত দুটো প্রথমে চাচার চোখেই পড়েছে।'

'প্রায় সারাটা জীবনই এখানে কাটিয়ে দিলাম,' মিস্টার ব্রুক বললেন, 'চোরের ছায়াও দেখিনি কখনও। ঘরের দরজা-জানালায় তালা তো দূরের কথা, ছিটকানিও লাগাইনি কোনদিন। কিন্তু হঠাৎ করেই বড় বড় শহরের মত চুরি-ডাকাতি আর নানা রকম অপরাধের কাজ শুরু হয়ে গেছে গাল আইল্যান্ডেও।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বাস্তবে ফিরে এলেন যেন। 'এই দেখো, খালি নিজের দুঃখের বয়ানই করে চলেছি। এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছ, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। চলো, ঘুমানোর জায়গা দেখিয়ে দিই। আমারও ঘুম পেয়েছে।'

'ভাববেন না, মিস্টার ব্রুক,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, 'জিনাকে তো খুঁজে বার করবই আমরা, আপনার গাছগুলোও খুঁজে বের করে দেব।'

'অত মিস্টার-ফিস্টার বলা লাগবে না, স্রেফ আঙ্কেল বলবে আমাকে,' বলে দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'নিজের বাড়ি মনে করবে। সামান্যতম অসুবিধে হলেও জানাবে আমাকে।'

একটা হুক থেকে চাবি খুলে নিয়ে কিশোরের হাতে ফেলে দিলেন তিনি। দশ নম্বর কটেজটার চাবি। ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন ওদের।

'সারি ধরে হেঁটে গিয়ে শেষ মাথার কটেজটা,' বলে দিলেন তিনি। 'জিনাকে দিয়েছিলাম তিন নম্বরটা। ও আসার পর ইভাও তার সঙ্গেই ঘুমাত।'

'থ্যাংকস, অ্যান্ড গুডনাইট, জেরি আঙ্কেল,' দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাত নাড়ল মুসা।

ইভাও চলল ওদের সঙ্গে। কিশোর বলল, 'আসা লাগবে না। তুমি যাও। আমরা চিনে নিতে পারব।'

'তোমরা আসায় একটা পাষাণ নেমে গেল আমার মন থেকে,' ইভা বলল। 'উফ্, কি দুশ্চিন্তাই যে হচ্ছিল।'

'আর দুশ্চিন্তার দরকার নেই,' রবিন বলল। 'জিনাকে খুঁজে বের করবই আমরা।'

ইভাকে 'গুডনাইট' জানাল তিন গোয়েন্দা। ঘরে ঢুকে ওর দরজায় ছিটকানি এবং শিকল লাগানোর শব্দ না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর রওনা হলো গাড়ির দিকে। ব্যাগ-সুটকেসগুলো আনতে হবে।

ওগুলো নিয়ে এল নিজেদের ঘরে।

খুব সুন্দর, বড় একটা ঘর। বড় বড় খাট। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে মুসা বলল, 'উফ্, বাপরে বাপ! এত কাহিল জীবনে হইনি!'

'হবেই। এত পথ গাড়ি চালানো কি সোজা কথা,' রবিন বলল।

'কথা না বলে আর, শুয়ে পড়ো,' কিশোর বলল। 'তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আবার ঘুম থেকে। সাতটার মধ্যে তদন্ত শুরু করে দেব। প্রথমেই খুঁজে দেখতে হবে গাড়িটা। যেটা থেকে নিখোঁজ হয়েছে জিনা।'

মুসা বলল, 'একবার ঘুমালে এখন আমার কানের কাছে কামান দাগলেও উঠতে পারব কিনা সন্দেহ। তবু, সকাল বেলা ঠেলাঠেলি করে দেখো।'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল কিশোর।

সবে শুয়েছে, হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।

ঝট করে উঠে বসল আবার কিশোর। মুসা আর রবিনও ঘুমায়নি এখনও। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

'ঘটনাটা কি···' বলতে গেল মুসা।

কিন্তু কথা শেষ হলো না তার। ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

তিন

'আই, কিশোর! কিশোর!' চিৎকার করছে ইভা। 'তোমাদের গাড়ি! জানালার কাঁচ ভেঙে কে জানি ঢোকার চেষ্টা করছে!'

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন গেল ইভার কাছে। মুসা আর কিশোর ছুটল গাড়ির দিকে।

'ওই যে যাচ্ছে! ওই যে ব্যাটা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর।

কিন্তু ধরা গেল না লোকটাকে।

'পালাল ব্যাটা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'সামনের বাঁ পাশের জানালাটা ভেঙেছে,' কিশোর বলল।

গাড়ির দিকে এগোল দু'জনে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রবিন আর ইভা।

গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল রবিন।

'কার-ফোনটা নিয়ে গেছে,' তারের ছেঁড়া মাথাটা তুলে দেখাল সে। 'আর কিছু মনে হয় নিতে পারেনি। ইভার চেঁচামেচি শুনে দৌড় দিয়েছে।'

নেয়ার মত আর তেমন কিছু ছিলও না ভেতরে। আগেই নিয়ে গেছে ওরা।

তবু, কিশোরও আরেকবার ভালমত দেখল, আর কিছু খোয়া গেছে কিনা।

সীটের ওপর পড়ে থাকা কাঁচের টুকরো পরিষ্কার করল। জানালায় আটকে থাকা টুকরোগুলোও টেনে টেনে তুলে ফেলে দিল। ফোকরটা বন্ধ করে দিল প্লাস্টিকের কাপড় দিয়ে। আরও একবার ইভাকে 'গুডনাইট' জানিয়ে শুতে গেল আবার নিজেদের ঘরে।

'কিছু একটা ঘটছে এখানে,' কিশোর বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। জিনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। আমরা যাতে ওকে খোঁজাখুঁজি না করি, সে-জন্যে নানা রকম শয়তানি শুরু করেছে এখন। ফোনটা নিয়েছে বটে, কিন্তু চুরি করার উদ্দেশ্যে আসেনি চোর। চুরি করতে এলে অত শব্দ করে জানালার কাঁচ ভাঙত না। নিঃশব্দে সারার চেষ্টা করত।'

'হুঁ,' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা। 'সকাল বেলা দেখব, শয়তানিটা কার। এখন ঘুমানো যাক।'

দ্বিতীয়বারের মত বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

রাতে আর কিছু ঘটল না।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। এক ডাক দিতেই উঠে গেল

রবিন। তাকে নিয়ে গাড়িটা দেখতে চলল কিশোর।

ময়লা হয়ে আছে গাড়িটা। প্রচুর ধুলো। ব্যবহার করা হয় না বোধহয়, পরিষ্কারও করেন না সে-জন্যে। অফিসের পেছনে ফেলে রেখেছেন। অফিসের অপরিষ্কার আসবাবপত্রগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। কোন কারণে সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন যেন মিস্টার ব্রুক।

'এই কিশোর, দেখো,' নাইলনের সুতোয় বোনা একটা ফিতে তুলে দেখাল রবিন। একদিকের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের কব্জায় আটকে ছিল।

সামনের সীটের নিচে খুঁজছিল কিশোর। ঘাড় ফিরিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিসের ফিতে?'

'যে কোন জিনিসের হতে পারে এটা,' রবিন বলল। 'টেপ প্লেয়ার, ক্যামেরা।'

'এটা না তো?' উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা স্পোর্ট-স্টাইল ক্যামেরা বের করে দেখাল কিশোর। ধাতব আংটার সঙ্গে ছেঁড়া ফিতের মাথাটা লেগে রয়েছে এখনও।

'পেলে নাকি কিছু?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠ।

'অ, ঘুম ভাঙল।' ক্যামেরাটা মুসাকে দেখাল কিশোর।

'আরি, জিনার এ রকম একটা ক্যামেরা ছিল না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। কব্জায় আটকে গিয়েছিল ফিতেটা। তাড়াহুড়ো ছিল, তাই খোলার চেষ্টা না করে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। ছবিটা তুলে নিয়েই লুকিয়ে ফেলেছিল সীটের নিচে।'

রবিনের দিকে তাকাল সে, 'রবিন, ছবিটা ডেভেলপ করা দরকার। মেইনল্যান্ডে চলে যাও। এক ঘণ্টায় ছবি দিয়ে দেয় যে সব দোকানে, ওদের কাছ থেকে করিয়ে আনো।'

'জানালাটা মেরামত করিয়ে আনব?'

'নাহ্, আপাতত দরকার নেই। পরে সময় করে করা যাবে। বৃষ্টি এলে প্লাস্টিক দিয়ে আটকেই ঠেকাব আপাতত।'

গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'আমরা চলো যাই পেলিক্যান লেনে। গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে। দেখে আসা দরকার।'

'চলো। ডেপুটি গেকো আসলেই সূত্র খুঁজেছে বলে আমার মনে হয় না। তাহলে এই ফিতে আর ক্যামেরাটা আমাদের হাতে পড়ত না।'

মিস্টার ব্রুকের গাড়িটা নিয়ে রওনা হলো দু'জনে।

কয়েক মিনিট পর জায়গাটাতে পৌঁছে গেল ওরা। ম্যাপ দেখে মুসাকে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। বালির ওপরে ইঁট বিছিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বালিতে টায়ারের দাগগুলো ভালমত লক্ষ করল সে। কিডন্যাপারের গাড়ির চাকার দাগ দেখলে যাতে পরে চিনতে পারে।

'বাড়িঘর তো নেই বললেই চলে,' চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'জিনার কিডন্যাপিঙের পর বিশেষ কেউ আর আসেনি বোধহয় এদিকে। এখনও সূত্র পাওয়ার আশা আছে।'

নোটবুক বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে নানা রকম টায়ারের দাগের নমুনা এঁকে নিচ্ছে কিশোর, এই সময় সেখানে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। স্টিয়ারিঙের নিচ থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল পেশীবহুল একজন লোক। কোমরের বেল্টে দুই হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে, হাঁটার তালে তালে রিভলভারের খাপ দোলাতে দোলাতে পুরানো ওয়েস্টার্ন সিনেমার নায়কদের মত কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি গেকো,' ভারিক্কি চালে পরিচয়টা জানিয়ে যেন কৃতার্থ করে দিতে চাইল গোয়েন্দাদের। 'ডেপুটি শেরিফ হেরিং গেকো।'

'মানে মৎস্য-গিরগিটি,' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মুসার। 'হেরিং' হলো মাছ আর 'গেকো' গিরগিটি।

'কি বললে?'

'না, কিছু না।'

'কিছু হারিয়েছ?' মৎস্য-গিরগিটি কথাটা বোধহয় শোনেনি গেকো, কিংবা শুনলেও ঠিক বুঝতে পারেনি। নইলে রেগে যেত, জানা কথা।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

কিন্তু ধরল না গেকো। আঙুল দুটো যে ভাবে ঢুকিয়ে রেখেছিল, সে-ভাবেই রাখল। গিরগিটির মতই মাথাটা একপাশে কাত করে এক চোখ উঁচু করে তাকাল। 'কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।'

'ও, তোমাদের কথাই বলেছে তাহলে গ্লেজব্রুক। নিখোঁজ মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছ তোমরা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি,' রায় দিয়ে দিল ডেপুটি। 'সুতরাং যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতে পারো।'

'কিডন্যাপ হয়নি, আপনি কি করে জানলেন?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হলো কিশোরের।

'তাহলে টাকা দাবি করে নোট পাঠাত, এ তো সহজ কথা।'

'সব সময় টাকার জন্যে কিডন্যাপ করে না। আরও নানা কারণ থাকে।'

'থাকে, অস্বীকার করছি না,' কথাটার কোন সদুত্তর না দিয়েই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল গেকো। 'তোমরা এখন অন্যের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছ। সেটা যে অপরাধ জানা আছে কি?'

'কিন্তু আমরা তো কোন ক্ষতি করছি না।'

'ওসব বুঝি না। এ জায়গাটা অন্য মানুষের। এবং আমি জানি, যার জায়গা, সে তোমাদের এখানে আসা পছন্দ করবে না।'

চারপাশে তাকিয়ে সাইনবোর্ড খুঁজল কিশোর। 'কই, কোথাও তো লেখা নেই।'

'সব সময় যে লিখে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই,' জবাব দিল শেরিফ। 'আমাকে রেখেছে তাহলে কিসের জন্যে? আমার কাজ, এ রকম অপরাধ যাতে না করে কেউ সেদিকে লক্ষ রাখা।'

'তাহলে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসা যেতে পারে।'

'ওই কথাটি চিন্তাও কোরো না,' কঠিন কণ্ঠে বলল ডেপুটি। 'বাইরে থেকে নাক গলাতে আসা দুটো বালকের সঙ্গে প্যাঁচাল পাড়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ আছে নীরা লেভিনের। এটা ট্যুরিস্ট স্পট, শান্তিতে সময় কাটাতে আসে লোকে। এখানে কোন রকম গোলমাল চাই না আমি, বলে দিলাম।'

'সে তো বুঝতেই পারছি,' মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। 'চলো হে, মুসা, ডেপুটি সাহেব এখানে শান্তি বজায় রাখতে থাকুন। আমরা অন্য কাজে যাই।'

গাড়িতে চড়ে রাস্তায় ওঠার পরও ওদের পিছু ছাড়ল না শেরিফ। শহরে ঢোকার পর তারপরে গেল।

শেরিফ চলে গেল সৈকতের দিকে, কুপার'স ডিনারটা সামনে দেখে তার পাশে এনে গাড়ি থামাল মুসা।

ছোট হল ঘরটায় ঢুকল দু'জনে। মাত্র একজন কাস্টোমার। সুবেশী একজন অল্প বয়েসী মহিলা। সোনালি চুল। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে।

কাউন্টারের উল্টো দিকে একটা টেবিলে লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল দুই গোয়েন্দা।

ওরা বসতেই এগিয়ে এল ওয়েইট্রেস মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ধূসর রঙ লেগেছে চুলে।

'মেন্যু লাগবে না আমাদের, ম্যাগি,' মহিলার হালকা নীল পোশাকের বুকে সুতো দিয়ে লেখা নাম দেখে বলল কিশোর। 'আমাদের জন্যে ডিম, হোম ফ্রাই, আর টোস্ট।'

'হোম ফ্রাই হবে না,' ম্যাগি জানাল। 'হ্যাশ ব্রাউন।'

'আনুন। ওতেই চলবে।'

খিদে পেয়েছে খুব। গোগ্রাসে গিলছে দু'জনে, এমন সময় পেছনের ঘর থেকে সরু একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল একজন লোক। ওর দাগ লাগা দোমড়ানো অ্যাপ্রনের বুকে লেখা রয়েছে 'কুপার'।

'ম্যাগি,' ওয়েইট্রেসকে বলল সে, 'গ্রিলে মাংস গেঁথে দিয়ে এসেছি। রান্নাটা শেষ করে ফেলগে।' অ্যাপ্রনে মুছল তেল মাখা হাত। 'ওই ডেপুটিটা যদি দ্বীপের এ সব শয়তানি বন্ধ করতে না পারে, পরের বার শেরিফের ইলেকশনে প্রার্থী হয়ে অবশ্যই তার বিরোধিতা করব আমি।'

মুখ তুলে তাকাল কাউন্টারে দাঁড়ানো সোনালি চুল মহিলা। 'কি আজেবাজে বকছ, কুপার!'

'না, সত্যি বলছি।'

'ষোলো বছর ধরে এক নাগাড়ে ডেপুটিগিরি করছে এখানে গেকো,' মহিলা বলল। 'তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে হেরে ভূত হবে, জানা কথা।'

'না, হব না। কেন এতদিন টিকে ছিল ওই হাঁদাটা, জানো? দ্বীপে কোন অপরাধ হত না বলে। এখন যখন ঘটতে শুরু করেছে, বেশিদিন আর টিকতে পারবে না। আমার কথা ডায়েরীতে লিখে নিতে পারো তুমি, নীরা।'

নীরা!

মাঝপথে থেমে গেল কিশোরের চামচ।

মুসারও কান খাড়া হয়ে গেছে।

'লেখালেখির আর দরকার নেই। যার যার নিজের পথ দেখা ভাল,' নীরা বলল। 'তোমার ভালটা তো কখনোই বুঝতে চাওনি। কতবার বলেছি, আখেরটা গুছিয়ে নাও, কিন্তু কানেই যায় না তোমার। ডেভলেপমেন্ট কোম্পানি এখনও তোমার জায়গাটা কিনে নিতে আগ্রহী।'

'এবং আমি এখনও বলছি,' জবাব দিল কুপার, 'জায়গা আমি বেচব না। "বেচো বেচো" করে বিরক্ত করতে এসো না তো আর দয়া করে।'

'শোনো, কুপার, ভেবে দেখো,' নীরা বলল, 'কি পাচ্ছ তুমি এই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা থেকে? এক কাপ কফি বেচতে গিয়ে দু'তিন কাপ বাড়তি দেয়া, দুটো ডিম ভাজা দিলে একটা ডিম ফ্রি দেয়া–এ সব করে কেউ ব্যবসা চালাতে পারে? লাভ হয় কিছু? বরং লস। অনেক বেশি লস। লোকসান দিতে দিতে শেষ হচ্ছ। আমি ব্যবসায়ী, আমি জানি। তারচেয়ে বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাও। কাজে লাগবে। কত চাও, নিজের মুখেই বলো বরং।'

মহিলাটাকে ভাল লাগল না কিশোরের। বুঝতে পারছে, কুপারও তাকে দেখতে পারে না।

'বেশ,' নরম হওয়ার ভান করল কুপার। 'জায়গাটা যখন এতই তোমার পছন্দ, যাও, দিয়ে দিলাম।'

রান্নাঘর থেকে সব কথাই বোধহয় কানে গেছে ম্যাগির। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করে বলল স্বামীকে, 'না না, কুপার, এ কি করছ!'

কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল কুপার, 'তুমি আবার এ সবে নাক গলাতে এলে কেন? যাও, নিজের কাজ করোগে!'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। প্রবল আগ্রহ নিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এই নাহলে পুরুষ মানুষের মত কথা,' হাসি ফুটেছে নীরার মুখে। চামড়ার পার্স থেকে চেক বই বের করল। 'বলো, কত চাও?'

দুই হাতের তালুর দিকে তাকাল কুপার। বিড়বিড় করল, 'দশ লাখ।'

দশ লাখ! দম আটকে ফেলল কিশোর।

'দশ লাখ, কি?' ভুল শুনেছে কিনা বুঝতে চাইল যেন নীরা।

'কি আবার, ডলার। দশ লাখ ডলার,' কুপার বলল। 'তুমি জানতে চেয়েছ, কত চাই। আমার দাম আমি বললাম। পছন্দ হলে নাও, নাহলে বিদেয় হও।'

'না না, বিদেয় হব কেন!'

চেক লিখতে শুরু করল নীরা।

চার

'খাইছে! এ জায়গার দাম দশ লাখ ডলার!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'হুঁ, বিশ্বাস তো আমারও হচ্ছে না,' কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর।

চেকটা কুপারের হাতে তুলে দিল নীরা।

হাতে নিয়ে দেখল কুপার। দেখল, সত্যি দশ লাখ লিখেছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে ছিঁড়তে শুরু করল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল। নীরার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'রসিকতা করলাম। কিছু মনে কোরো না।'

কুপারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নীরা। দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল দরজার দিকে।

'উফ্, বাঁচলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাগি। 'আমি তো ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি বুঝি তুমি...'

'দশ লাখ কেন, দশ কোটি টাকা দিলেও এ জায়গা বেচব না আমি,' কুপার বলল।

'এক্সকিউজ মী,' কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল কিশোর, তার পেছনে এগোল মুসা। 'আপনাদের কথাবার্তা সব শুনে ফেলেছি। গাল আইল্যান্ডে প্রচুর জায়গা আছে নাকি নীরা লেভিনের?'

'প্রচুর কি বলছ?' খড়খড় করে উঠল ম্যাগি। 'গাল আইল্যান্ডের অর্ধেকটাই তো তার।'

'আসলে,' শুধরে দিল কুপার, 'জমি বেচাকেনার যে কোম্পানিতে সে কাজ করে, জায়গাগুলো তাদের। কোম্পানির মালিক ডগলাস কেইন। কারলুর শেষ ধারে, সৈকতের কিনারে তার বাড়ি। এত ধনী, যা ইচ্ছে তাই কিনতে পারে।'

'হ্যাঁ,' ঘৃণায় নাক কুঁচকাল ম্যাগি। 'আর তার কেনা সম্পত্তির মধ্যে একটা হলো ওই নীরা লেভিন।'

'কিন্তু জায়গা বেচার জন্যে এত চাপাচাপি করছে কেন ওরা?' জানতে চাইল কিশোর।

'টাকা কামাইয়ের নতুন ধান্দা!' রুক্ষ শোনাল ম্যাগির কণ্ঠ।

'গুজব শোনা যাচ্ছে,' কুপার জানাল, 'চিরকালই ক্যাসটিলো কী'র দরিদ্র প্রতিবেশী এই গাল আইল্যান্ড। ক্যাসটিলোর পুরো পশ্চিম উপকূলটাই উপসাগরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সবখানে রয়েছে সাদা সৈকত। সংস্কার করা হয়েছে ওগুলোর। নীরার মত উন্নয়নকারীরা আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটাকেও আরেকটা ক্যাসটিলো কী বানিয়ে ফেলতে চাইছে। আরেকটা গুজব আমি শুনেছি, ডগি, মানে ডগলাস নাকি গাল আইল্যান্ডটাকে একটা প্রাইভেট রিসর্ট বানানোর স্বপ্ন দেখছে। এখানে আসতে হলে তখন তোমাকে এটার মেম্বার হতে হবে। সরাসরি আর এ

ভাবে চলে আসতে পারবে না।'

'কিন্তু তারপরেও,' মুসা বলল, 'আপনার এই জায়গাটুকুর জন্যে দশ লাখ ডলার অনেক বেশি না?'

'তা তো বেশিই,' কুপার বলল। 'রেস্টুরেন্টটা দিয়ে দিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু বাড়িটা তো ছাড়তে পারব না। বহু বছর ধরে আছি। আমার মত আরও অনেকেই আছে। ভালবেসে ফেলেছি দ্বীপটাকে। হোক না সাধারণ, কিন্তু এ তো এখন বাড়ি। আর আমরা চাই, এখন যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকুক দ্বীপটা। অন্য কিছু হলে আমাদের বিদেয় হতে হবে।'

'তারমানে আপনার ধারণা,' কিশোর বলল, 'ডগলাস আপনাকে তাড়াতে চাইছে?'

'তোমার কি মনে হয়?' ভুরু নাচাল কুপার। 'হঠাৎ করেই যদি কোন জায়গায় অকারণে অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব শুরু হয়ে যায়...'

'এবং কিডন্যাপিং,' যুক্ত করল মুসা।

'হ্যাঁ, ওই মেয়েটার কথা শুনেছি,' কুপার বলল। 'আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করেনি ওই গেকোটা। মেয়েটার জন্যেই এলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান। গত রাতে এসেছি আমরা। আমাদের আরও এক বন্ধু এসেছে, রবিন মিলফোর্ড। জিনার কি হয়েছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছি আমরা...'

বাইরে খোয়ার মধ্যে টায়ার ঘষার কর্কশ শব্দে ছেদ পড়ল কথায়। গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। ছুটে ঘরে ঢুকল রবিন।

সদ্য প্রিন্ট করে আনা ছবিগুলো তুলে দিল কিশোরের হাতে।

'বাহ্, বড় তাড়াতাড়ি দিল তো,' কিশোর বলল।

'চলো, টেবিলে গিয়ে বসে দেখা যাক,' মুসা বলল।

'এক্সকিউজ আস, কুপার,' বলে টেবিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। তিনজনে এসে বসল আবার আগের টেবিলটায়। রবিনের জন্যেও খাবারের অর্ডার দেয়া হলো।

ছবিগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দেখতে শুরু করল ওরা।

'এটা দেখো, বেশ স্পষ্ট,' একটা ছবি দেখাল রবিন।

মিস্টার ব্রুকের কাঠের তৈরি কেবিন ক্রুজারের সামনে দাঁড়ানো জিনা আর ইভা। কিশোরের কাছে এটা সাধারণ ছবি মনে হলো।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছবিতে আটকে গেল তার চোখ। টেনে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এটাই আমাদের দরকার!'

হাতে নিয়ে তিনজনেই ভালমত ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বোঝার চেষ্টা করল। ছবিতে আরেকটা গাড়ির পেছনের অংশ দেখা যাচ্ছে। মিস্টার ব্রুকের গাড়িতে বসে তোলা। তাড়াহুড়া করে তোলার কারণে অস্পষ্ট রয়ে গেছে ছবির অনেক কিছু। বোঝা কঠিন।

ছবির এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'দেখো, এটা জেরি আঙ্কেলের

গাড়ির জানালার ফ্রেম। এটা গাড়ির হুড।'

'আর এটা,' রবিন বলল, 'সামনের গাড়িটার পেছনের বাম্পার।'

'ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'আর এটা দেখো। সাদা-কালো স্টিকার। বাম্পারের বাঁ সাইডে, নিচের দিকে লাগানো। কোন ধরনের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর।'

'ভাড়া করা গাড়ির এ সব থাকে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'কোম্পানির নিজস্ব একটা সিরিয়াল নম্বর দিয়ে রাখে গাড়িতে।'

'এ ছবিটা বড় করা দরকার,' কিশোর বলল। 'আমি শিওর, এ গাড়িটা দিয়েই জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এই কোড নম্বরটা যতক্ষণ না বুঝতে পারছি...'

খাওয়া শেষ করে আর দেরি করল না রবিন। উঠে দাঁড়াল। 'এনলার্জ ছবিটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি।'

বেরিয়ে গেল সে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা আর বসে থেকে কি করব? চলো, একটু সৈকতের দিক থেকে ঘুরে আসি।'

'ওদিকে কেন?' বলতে গেল মুসা।

'তদন্ত করতে। ভুলে যাচ্ছ কেন, সৈকতে যাবার পথেই নিখোঁজ হয়েছে জিনা। বলা যায় না, জরুরী সূত্র পেয়ে যেতে পারি ওদিকে।'

কুপারের বিল মিটিয়ে দিল কিশোর। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চাপল দু'জনে। স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণে গাড়ি ঘোরাল মুসা। মেইন রোড ধরে সৈকতের দিকে চলল।

'কি বলেছিলাম? দিনের বেলা দারুণ লাগবে!' চতুর্দিকের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিস দিতে শুরু করল কিশোর।

একটা মোড় ঘুরতেই সাদা সৈকত চোখে পড়ল। নারকেল আর উঁচু উঁচু রয়্যাল পামের সারি তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সৈকতটাকে। সারা দ্বীপে এখানেই কিছু মানুষের ভিড় দেখা গেল।

'দিনটা কিন্তু পানিতে নামার মতই,' লোভাতুর দৃষ্টিতে সাগরের নীল পানির দিকে তাকাল মুসা।

হাসল কিশোর। 'পরে। সাঁতার কাটার অনেক সুযোগ পাবে।'

বালির প্রান্তে সারি দিয়ে থাকা গাছের ছায়ায় গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নামল দু'জনে।

শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন শুনে ফিরে তাকাল মুসা। পেছনের একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা-কালো ট্রাক। তীব্র গতিতে ছুটে এল ওদের দিকে।

এক ধাক্কায় কিশোরকে রাস্তার কিনারে ফেলে দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রাকটার গরম বাতাসের ধাক্কা লাগল গায়ে। দেখতে দেখতে ট্রাকটা মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার অন্য পাশে।

'বড় বেশি তাড়াহুড়া মনে হচ্ছে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর।

গা থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভারের চেহারা

দেখেছ?'

'না। দেখার সুযোগ পেলাম কোথায়? কাল রাতে যে গাড়িটা পিছু নিয়েছিল আমাদের, ওইটা, তাই না?'

'তাই তো মনে হলো,' মুসা বলল। 'তবে এবারও লাইসেন্স প্লেটটা দেখতে পারিনি। এমন করে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে গেল।'

গাড়িটার ভাবনা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিল কিশোর। ইভা জানিয়েছে, সে আর জিনা এদিকের সৈকতে এলে পানির কিনারে একটা পামের জটলার কাছে বসে গায়ে রোদ লাগাত। কোথায় আছে সে-রকম জায়গা, খুঁজতে শুরু করল তার চোখ।

কিছুটা দূরে সৈকত ঘেঁষে একটা লাল রঙের বাড়ি দেখতে পেল। সামনে সবুজ লন। 'ওটাই সম্ভবত ডগলাস কেইনের বাড়ি।'

শিস দিয়ে ফেলল মুসা। 'খাইছে! বাড়ি একখান!'

দোতলা মূল বাড়িটা ছাড়াও একটা গেস্ট হাউস, পাঁচটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ, আর অনেকগুলো কুকুরের ঘর আছে। গ্যারেজের পাশে দাঁড়ানো একটা কালো সিডান গাড়ি। খানিক দূরে কংক্রীটের প্যাডের ওপর রাখা একটা ছোট হেলিকপ্টার।

'সাংঘাতিক ধনী তো লোকটা,' কিশোর বলল।

'সে তো বটেই,' মুসা বলল। 'কুপাররা বলল না, যা কিনতে ইচ্ছে হয়, কেনার ক্ষমতা আছে ডগলাস কেইনের।'

নিচু একটা দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। সর্বসাধারণের জায়গা থেকে বাড়ির সীমানা ভাগ করা হয়েছে ওই দেয়াল দিয়ে। দেয়ালের দুই প্রান্ত থেকে ছোট ছোট খুঁটির সারি চলে গেছে সৈকতের ওপর দিয়ে পানির কাছে। খুঁটিগুলোতে শিকল লাগিয়ে বেড়া বানিয়ে আলাদা করে দেয়া হয়েছে সৈকতটা। শিকলের ভেতরটা 'ব্যক্তিগত' বুঝিয়ে দিয়েছে।

'কি ভাবছ?' ভুরু নাচাল মুসা। 'চলে যাব নাকি ওপাশে?'

'আমি তো জানতাম, সৈকতের কোন মালিক থাকে না। তা ছাড়া ভেতরে ঢোকা বেআইনী কথাটা যখন কোথাও লেখা নেই,' মুচকি হাসল কিশোর, 'ঢুকে পড়লামই বা।'

সহজেই বেড়াটা ডিঙিয়ে চলে গেল মুসা। তার পেছনে রইল কিশোর। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে যেতে লাগল 'ডগলাসের সৈকত' ধরে। দেয়ালের গায়ে গেট দেখে ভেতরে ঢোকার জন্যে মোড় নিল।

'যদি দেখে?' মুসার প্রশ্ন।

'কি আর করবে?' কিশোর বলল আবার। 'বড়জোর তার সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে...'

কথা শেষ না করেই থমকে দাঁড়াল সে। কুকুরের ডাক কানে এসেছে। কোন্ দিক থেকে এল?

জানার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বাড়ির সীমানায় পা দিতে না দিতেই দেখে মূল বিল্ডিংটার পাশ ঘুরে ছুটে বেরিয়ে আসছে তিনটা কুকুর।

ভয়ঙ্কর ডোবারম্যান পিনশার। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত বের করে গর্জন করছে চাপা স্বরে।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

লন মাড়িয়ে ছুটে আসছে কুকুরগুলো। সামনের কুকুরটা, বিরাট একটা কালচে-বাদামী জানোয়ার সোজা ধেয়ে আসছে কিশোরের দিকে।

পাঁচ

'কিশোর, জলদি!' বলে এক চিৎকার দিয়েই ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা। লাফ দিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল নিচু দেয়ালটায়। কিশোর কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল।

প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে কিশোর। কুকুরগুলোকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। পায়ের কাছে খটাস খটাস চোয়াল বন্ধ করছে সামনের কুকুরটা। যে কোন মুহূর্তে কামড় লেগে যাবে।

কিশোরও দেয়ালটার কাছে পৌঁছে গেল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল দেয়ালে। উঠতে সাহায্য করল তাকে মুসা। এক মুহূর্ত দেরি না করে লাফ দিয়ে উল্টো দিকের সৈকতে নেমে পড়ল দু'জনে। বালি মাড়িয়ে ছুটতে লাগল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সৈকতে বেরোনোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল কুকুরগুলো। পেছন পেছন আসতে লাগল।

উপায় না দেখে আবার দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল ওরা। দেয়ালে বসে থাকা নিরাপদ নয়। নিচু। লাফ দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে কুকুরগুলো। বাঁচতে হলে কোন ঘরেটরে ঢুকে পড়তে হবে।

লন ধরে ছুটতে ছুটতে চোখের কোণ দিয়ে বাদামী একটা ছায়া দেখতে পেল কিশোর। কাছে এসে গেছে সামনের কুকুরটা।

ঘুরে দাঁড়াল মুসা। বুঝে গেছে দৌড়ে পরাজিত করতে পারবে না ওই ভয়ানক জানোয়ারগুলোকে। অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটা লন চেয়ার তুলে নিয়ে বাড়ি মারার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

'অ্যাই, থাম!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ শোনা গেল।

চোখের পলকে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরগুলো। একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে তাকাল মনিবের দিকে। স্লাইডিং ডোর সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একজন লোক।

রোদে বেরিয়ে এল লোকটা। ভুরু কুঁচকে রেখেছে। গোয়েন্দারা তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হাসল। কিন্তু চোখের শীতলতা কাটল না তাতে।

'দারুণ জিনিস পুষছেন,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ঠিকই বলেছ,' লোকটা জবাব দিল। 'তোমাদের আগে যে লোকটা কাউকে কিছু না বলে বাড়িতে ঢুকেছিল, কামড়ে তাকে মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।'

'আমাকে কিছু করার আগে আমি ওর ঘাড়টা ভেঙে দিতাম,' হাতের চেয়ারটা

মাটিতে ফেলে দিল মুসা।

'ডগলাস কেইন,' মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।

'কিশোর পাশা,' কেইনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।'

'জানি,' কেইন বলল।

'সত্যি?' কিশোর অবাক। 'কি করে জানলেন?'

'জানানোর লোক আছে আমার,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেইন। 'তা গাল আইল্যান্ডে কি উদ্দেশ্যে?'

'আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এখান থেকে,' জবাব দিল কিশোর। 'জরজিনা পারকার। আমাদের বিশ্বাস, কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।'

'গুরুতর অভিযোগ,' হাসি মুছল না লোকটার মুখ থেকে। 'কিন্তু রোদের মধ্যে গরমে দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে?'

ঠাণ্ডা খাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের, কিন্তু ঘরের ভেতরটা দেখার সুযোগটাও ছাড়তে চাইল না। রাজি হয়ে গেল।

'জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে, কিছু আবার ভেবে বোসো না। গোছানোর সময় পাই না,' দামী দামী জিনিসপত্রে সাজানো একটা সান-রূম পেরিয়ে দু'জনকে বিরাট রান্নাঘরে নিয়ে এল কেইন। সাদা বিশাল কাউন্টারটাতে অসংখ্য বাক্স আর বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে। কিশোরকে সেগুলোর দিকে তাকাতে দেখে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় একটা ছোটখাট পার্টি আছে।'

ইনটারকমে কথা বলল কেইন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল একজন লোক। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশের কম হবে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উস্কখুস্ক চুল। পেশী যেন ফুটে বেরোচ্ছে। নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে উঠছে হাতের পেশী।

'এনডি টাওয়ার,' গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কেইন। 'এনডি, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।'

'আরেকটু হলেই ওদের চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম আজ,' এনডি বলল, যেন মস্ত বড় একটা রসিকতা। 'রাস্তায় হাঁটার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত তোমাদের।'

'যাই বলেন, দারুণ একখান ট্রাক কিন্তু আপনার,' খোঁচাটা না দিয়ে ছাড়ল না কিশোর। 'রাস্তায় বেরোলেই দেখা হয়ে যায়...'

'বাদ দাও ওর কথা,' কিশোরকে থামিয়ে দিল কেইন। 'এনডি, ওদের সোডা দাও।'

বিশাল রেফ্রিজারেটর থেকে চার ক্যান সোডা বের করল এনডি।

'বাপরে বাপ, কতবড় ফ্রিজ! প্রচুর খাবার ধরে নিশ্চয়,' রেফ্রিজারেটরটার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। রসে ভেজানো কালো আঙুরের একটা ক্যান বের করল মুসা। 'খাবই যখন, ভাল করে খাই।' ক্যানটা খুলতে গিয়ে ফ্রিজের দরজার দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল তার হাত। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শরীরে।

কিশোর তখন সৈকতে তোলা ইভা আর জিনার যুগল ফটোগ্রাফটা দেখাচ্ছে

কেইনকে। 'মাত্র গত সপ্তাহে তোলা।'

ছবিটার দিকে ঠিকমত তাকালও না কেইন। 'সরি। কখনও দেখিনি একে।'

এনডিকে দেখাল কিশোর। 'আপনি দেখেছেন?'

'উঁহু,' না দেখেই বলে দিল এনডি। পরে তাকাল ছবির দিকে।

'আপনি শিওর?'

'মেয়েটা সুন্দরী, কোন সন্দেহ নেই। চোখে পড়ার মত। দেখলে ঠিকই মনে থাকত।'

রেফ্রিজারেটরের কাছ থেকে ফিরে এল মুসা। উত্তেজনা চাপা দিতে কষ্ট হচ্ছে তার। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে যাবে, ফোন বাজল দোতলায়।

'কোরি, ধরো তো!' দরজার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল এনডি।

ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে যাচ্ছে কোরি।

কয়েক সেকেন্ড পর রান্নাঘরে উঁকি দিল আরেকটা লোক, 'বস্, আপনার ফোন! মিয়ামি থেকে।' এনডি যেমন লম্বা, কোরি তেমনি খাটো। হালকা-পাতলা। মাথার কালো লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। এনডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কুকুরগুলোকে ঘরে আটকে রাখতে যাচ্ছি।'

'যাও,' বলে ডাকল আবার কেইন, 'কোরি, শোনো। এদের নাম জানো? ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।'

অস্বস্তিভরা চোখে ওদের দিকে তাকাল কোরি, কিছু বলল না।

'আপনারা মনে হচ্ছে সবাই খুব ব্যস্ত,' কিশোর বলল কেইনের দিকে তাকিয়ে। 'আমরা বরং চলে যাই।'

কিন্তু যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের। তার ধারণা, যত বেশি সময় থাকা যাবে, তত বেশি সূত্র পাওয়া যাবে। একটা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই শিওর হয়ে গেছে—ওদেরকে ফলো করে আসা ট্রাকটার মালিক ডগলাস কেইন।

কেউ কিছু বলছে না দেখে থাকার আশা ত্যাগ করল কিশোর। 'সোডা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। আর কুকুরগুলোকে ডেকে ফেরানোর জন্যেও।'

'তোমাদেরকেও ধন্যবাদ,' কেন ধন্যবাদ দিল, সে-কথাটা আর খোলসা করল না কেইন। 'কোরি, তুমি আর এনডি ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে এসো। দেখো, কুকুরগুলো যেন আর বিরক্ত করতে না পারে।'

বাইরের ঘরে কিশোররা ঢুকেছে, এই সময় দরজার বাইরে নীরা লেভিনকে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এনডি, কাঁচের স্লাইডিং ডোরের ছিটকানিটা খুলে দেয়ার জন্যে।

ভেতরে ঢুকে কিশোরদের দেখে থমকে দাঁড়াল নীরা। 'কোথায় যেন দেখেছি তোমাদের?...ও, কুপারের রেস্টুরেন্টে। আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'আপনার পিছু নেব কেন?' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার অনেক আগেই আমরা এসেছি।'

মনে মনে রেগে গেলেও রসিকতার ঢঙে মুসা বলল, 'মনে তো হচ্ছে আপনিই আমাদের অনুসরণ করে এসেছেন।'

'হয়েছে, হয়েছে! আমার কথা তুলে নিলাম!' নীরস স্বরে জবাব দিল নীরা।

'একটা মেয়েকে খুঁজতে এসেছে ওরা এখানে,' বিশ্রী একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল এনডি। 'আমরা বলে দিয়েছি সে এখানে নেই। তাই ওরা এখন চলে যাচ্ছে।'

ওদের দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল এনডি, কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ছবিটা বের করে জিনার ছবিতে আঙুল রেখে দেখাল নীরাকে। 'দেখুন তো, আপনি দেখেছেন নাকি?'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে নীরা, কিশোর তার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা।

'তিন দিন হলো নিখোঁজ হয়েছে,' কিশোর বলল। 'ভাবলাম, মিস্টার কেইন কিংবা তাঁর কর্মচারীদের কেউ দেখে থাকতে পারে, সৈকতের এত কাছে বাড়ি যখন।'

'মেয়েটা সুন্দরী,' নীরা বলল। 'হ্যাঁ, দেখেছি ওকে। সৈকতে ঘোরাফেরা করতে। দ্বিতীয় মেয়েটার সঙ্গে।'

'ওদের সঙ্গে আর কাউকে দেখেছেন?'

'উঁহু। ওদেরকেও দেখতাম না যদি লোক বেশি থাকত। এ সীজনে ট্যুরিস্ট খুব কম এসেছে। সৈকতে লোক প্রায় ছিলই না।'

'শুনলাম, ট্যুরিস্ট আসা কমে যাওয়ার পেছনে নানা রকম কারণ রয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব খুব বেড়ে গেছে দ্বীপে। ট্যুরিস্ট নেই, ব্যবসা নেই—ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছে। মিস্টার কুপারের মত।'

'ওই গাধাটার কথা আর বোলো না!' রেগে উঠল নীরা। 'ও রকম একটা জায়গার জন্যে দশ লাখ ডলার হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয় সে আস্ত বোকা!'

'কিংবা যে অত টাকা দেয়,' খোঁচা মারতে ছাড়ল না কিশোর।

বরফের মত শীতল হয়ে গেল নীরার দৃষ্টি। এনডির দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'বের করে দিয়ে এসো ওদের!'

কিশোরকে বলার জন্যে তর সইছে না মুসার। ওদের বাইরে বের করে দিয়ে এনডি চলে যেতেই বলল, 'জানো, কি দেখে এলাম?'

'কি?'

'নানা রকমের ছবি চুম্বক দিয়ে আটকে রেফ্রিজারেটরের দরজা সাজিয়েছে।'

'ফ্রিজের দরজা ওরকম অনেকেই সাজায়,' কিশোর বলল। 'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?'

'আছে। পারকার আঙ্কেলের ছবি যদি লাগানো থাকে ডগলাস কেইনের ফ্রিজের দরজায়, অবাক হবে না?'

ছয়

'তারমানে জিনাই ছবিটা লাগিয়েছে ফ্রিজের দরজায়,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। আর কে লাগাবে?' মুসা বলল।

'অথচ কেইন আর তার কর্মচারীগুলো স্রেফ অস্বীকার করল, জিনাকে দেখেনি। ছবির দিকে না তাকিয়েই। কিন্তু সে ছাড়া ওই ফ্রিজে আর কেউ লাগায়নি তার বাবার ছবি। কোন এক সুযোগে লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্যে সূত্র। সে জানে, ওর নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনলে আসবই আমরা। ছবিটা ছাড়া আর কিছু আছে?'

'না। থাকলেও দেখিনি।'

'আবার ঢুকতে হবে ওই বাড়িতে,' কিশোর বলল। 'জিনার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কেইনের হাত থেকে থাকলে ওই বাড়িতেই তাকে আটকে রেখেছে।'

'পার্টির সময় ঢুকে পড়লে কেমন হয়? সবাই ব্যস্ত থাকবে পার্টি নিয়ে, আমাদের কেউ লক্ষ করবে না।'

'ঠিক বলেছ,' পরামর্শটা পছন্দ হলো কিশোরের। 'এখন চলো, মোটেলে ফিরে যাই। রবিনের ফেরার অপেক্ষা করি।'

গাড়িতে উঠে ফিরে চলল ওরা।

ওয়াইল্ড পাম হোটেলের সামনে এনে গাড়ি থামাল মুসা। ভ্যানটার কাছে। ফিরে এসেছে রবিন। ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।

ব্রেক করেও সারতে পারল না মুসা, ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল রবিন। ১২ বাই ১৪ ইঞ্চি একটা ছবি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো তো, কেমন হলো?'

গাড়ি থেকে নেমে এসে ছবিটা হাতে নিল কিশোর। একবার দেখেই বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছিলাম। আইডেন্টিফিকেশন নম্বরই এটা।'

'বেশির ভাগ নম্বরই অস্পষ্ট, বোঝা যায় না,' রবিন বলল। 'দোকানের লোকটা বলল, এরচেয়ে ভাল করার আর সাধ্য নেই তার।'

'ঠিকই বলেছে,' একমত হলো কিশোর, 'এর চেয়ে ভাল আর কেউই করতে পারবে না। শেষ তিনটে সংখ্যা পড়া যাচ্ছে এখন–তিন, দুই, ছয়।'

মুখ তুলে তাকাল সে। 'এখন আমাদের পরবর্তী কাজ রেনটাল কার এজেন্সিকে ফোন করা। শেষ তিনটা সংখ্যা মেলে এ রকম ক'টা গাড়ি আছে তাদের, খোঁজ নেয়া।'

মোটেলের অফিস ঘরে ঢুকল ওরা।

ওদের দেখেই বলে উঠলেন মিস্টার ব্রুক, 'আর বোধহয় টিকতে পারলাম না!' কাউন্টারের ওপর একটা কাগজ রেখে ওদের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'পড়ো এটা।'

'কি?' তুলে নিল কিশোর। 'রেডস্টার বুকিংস। কিসের কোম্পানি?'

'পড়ো না, তাহলেই বুঝতে পারবে। ওরা আমার কাস্টোমার জোগাড় করে দেয়। কাস্টোমারের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে মোটেলে বুকিঙের ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে কমিশন পায়।'

কাগজটা জোরে জোরে পড়ল কিশোর: 'আমরা আর ওয়াইল্ড পাম মোটেলের সঙ্গে চুক্তিতে থাকতে পারছি না।'

'কি কারণ?' জানতে চাইল রবিন।

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না,' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন মিস্টার ব্রুক। 'ফোন করেছিলাম। জবাব দিল না। আমার কাছে একটা টাকাও পাবে না ওরা। সব পাওনা সময় মত দিয়ে দিয়েছি। কোন অভিযোগ নেই আমার বিরুদ্ধে। মোট কথা, কাজ না করার কোন কারণই নেই।'

'তারমানে কেউ ওদের কাজ করতে মানা করেছে,' কিশোর বলল।

'মনে হয়। প্রচুর টাকা খাইয়েছে, কিংবা অন্য কোন ভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। আমার ডক ভেঙে দিয়েছে, গাছ চুরি করেছে, এখন আমার ব্যবসার ওপর হাত দিয়েছে। জায়গাটা বিক্রির জন্যে মোটা টাকা দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। আমি শুনিনি। এটাই সম্ভবত আমার অপরাধ। মনে হচ্ছে এরপর আমার বোটটার ওপর নজর দেবে। তাড়াতাড়ি ওটা মেরিনায় সরিয়ে না ফেললে—যেখানে পাহারার ব্যবস্থা আছে, ওটাও খোয়াতে হবে আমাকে।'

'আপনার বন্ধু কুপার কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছেন,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় আপনারও এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।'

'বলার চেয়ে করা কঠিন,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক।

'আজকের দিনটা অন্তত চুপ করে থাকুন। কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত মাথায় চিন্তা করার মত অবস্থা নেই।'

মিস্টার ব্রুককে চুপ করে থাকতে দেখে কিশোর বলল, 'আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জিনার কিডন্যাপের সঙ্গেও এ সবের কোন সম্পর্ক আছে। একটা রহস্যের সমাধান হলে আরেকটারও হয়ে যাবে।'

'কিছু কিছু যুদ্ধ আছে, যেগুলো করে কোন লাভ হয় না,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'যাকগে, আমি কোন কথা দিতে পারছি না তোমাদেরকে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে এল ইভা।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'

'চলো, গাড়িটার খোঁজ-খবর করা যাক,' জবাব দিল কিশোর। 'তারপর খেতে যাব কুপার'স ডিনারে।'

'চলো, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে,' ইভা বলল।

খোঁজাখুঁজি করতে অনেক সময় গেল। লাঞ্চ করতে কুপার'স ডিনারে যখন গেল ওরা, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গিয়ে প্রায় ডিনারের সময় হয়ে গেছে।

মজার ব্যাপার, কাকতালীয় ভাবে ওখানেই সবুজ গাড়িটার খোঁজ পেয়ে গেল ওরা। তবে ওটাই আসল গাড়িটা কিনা, নিশ্চিত হতে পারল না। যদিও শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়। গাড়িটার রঙও সবুজ।

গাড়িটা যে নিয়ে এসেছে, সে-ও কুপার'স ডিনারে কফি খেতে ঢুকেছে।

লোকটার কালো চুল। চামড়ার রঙ মোমের মত ফ্যাকাসে।

লোকটা বেরিয়ে গেলে ম্যাগিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওর নাম হারম্যান কেগ।

'মাসখানেক হলো এসেছে,' ম্যাগি জানাল। 'বিচিত্র স্বভাব। কারও সঙ্গে কথা বলে না। ঢোকে, চুপচাপ খেয়েদেয়ে বিল দিয়ে চলে যায়।'

'কোথায় থাকে, বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শুনেছি পেলিক্যান লেন-এ,' ম্যাগি বলল।

'আমিও তাই শুনেছি,' পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল কুপার। 'লোকটা চোর-ডাকাত হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।'

'শুধু কি চোর,' ম্যাগি বলল। 'শুনলাম, শিকাগো থেকে এসেছে সে। ওখানে মানুষ খুন করে পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ, এ গল্প আমিও শুনেছি,' কুপার বলল। 'কেউ কেউ বলে, আসলে লোকটা একটা বিদেশী স্পাই। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নিজের দেশের লোকেরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে-জন্যে গাল আইল্যান্ডে এসে লুকিয়ে আছে।'

'চোর-ডাকাত-খুনী-স্পাই, যা-ই হোক,' ইভা বলল, 'লোকটা যে খারাপ, দেখলেই বলে দেবে যে কেউ। আরও কিসের কিসের সঙ্গে জড়িত, কে জানে!'

'সেটা জানতে যাওয়ার জন্যে এখনও দিনের কিছু আলো অবশিষ্ট আছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'চলো তাহলে,' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা, 'ফরেন স্পাই মিস্টার হারম্যান কেগ জিরো জিরো সেভেনের সঙ্গে দেখাটা সেরেই আসি।'

সাত

পেলিক্যান লেনে মোড় নেয়ার সময় গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। অনেক জমিতে মলিন হয়ে আসা 'বিক্রয় হইবে' সাইন দেখা গেল। একটা বাড়ি দেখা গেল, শূন্য, নির্জন, পরিত্যক্ত। গভীর মনোযোগে সব লক্ষ করছে কিশোর।

'রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যাও,' মুসাকে বলল সে। 'হারম্যান কেগ কোন বাড়িতে আছে দেখে নেয়া যাক। তারপর খানিকটা সরে এসে রাস্তার দিকে মুখ করে গাড়ি পার্ক করো।'

'তাতে লাভটা কি?' জিজ্ঞেস করল ইভা। অস্বস্তিতে ভরা কণ্ঠ।

মুচকি হাসল কিশোর। 'তাতে লাভটা হলো বিপদ দেখলে এক মুহূর্ত দেরি না করে পালাতে পারব।'

একটা কটেজ টাইপের বাড়িতে থাকে কেগ। ছোট একটা রঙচটা ডেকের মত বারান্দা বেরিয়ে আছে সামনের দরজার গোড়া থেকে। তার ওপরে চালা। একপাশে বড় বড় জানালা বাড়িটার, একেবারে মেঝে থেকে ছাতে গিয়ে ঠেকেছে। ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের দিকে মুখ করা। ক্যাসটিলো কী'র চমৎকার দৃশ্যাবলীর অনেক

কিছুই দেখা যাবে ওখানে দাঁড়ালে। দেখার জন্যেই বানানো হয়েছে ওভাবে জানালাগুলো। দেয়ালের রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। চলটা উঠে উঠে বিশ্রী ক্ষতের মত দেখাচ্ছে। চড়া রোদে খুব সহসাই রঙের ছিটেফোঁটাও আর থাকবে না বোঝা যায়। কেবল চারপাশ ঘিরে থাকা পামের সারির কোন পরিবর্তন নেই, বাড়িটার রুক্ষতার মাঝে মোলায়েম প্রলেপ যেন ওগুলো।

প্রবালে তৈরি, অযত্নে নোংরা হয়ে থাকা গাড়ি বারান্দায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুসাকে বলল কিশোর, 'তোমার জিরো জিরো সেভেন মনে হয় ঘরেই আছে।'

গাড়ি ঘুরিয়ে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল মাটিতে।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'তুমি আর ইভা গাড়িতেই থাকো। পাহারা দাও। আমরা আসছি।'

মুসাকে নিয়ে বাড়িটার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল কিশোর। তারপর দরজার দিকে এগোল।

টোকা দেয়ার আগেই খুলে গেল দরজা । দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেগ। তারমানে নজর রাখছিল সে।

'কি চাও?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কেগ।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল,' কিশোর বলল। 'যদি কিছু মনে না করেন।'

'আর যদি করি?'

কেগের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'ভেতরে আসব?'

'আমার গাড়ির কাছে কি করছিলে তোমরা? কেন বিরক্ত করছ শুধু শুধু?' কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল কেগ। ওদের মুখের ওপর দরজাটা যাতে বন্ধ করে দিতে পারে।

'বেশি সময় নেব না,' অনুরোধ করল কিশোর।

'তোমাদের সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না,' গোঁয়ারের মত বলল কেগ। 'তোমাদেরকে আমি চিনিও না।'

'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান।'

কেগকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল কিশোর, 'আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এ দ্বীপ থেকে।'

প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে জিনা আর ইভার যুগল ফটোটা বের করে দেখাল সে।

গভীর মনোযোগে ছবিটা দেখল কেগ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে, কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল কেগ। 'এদের কাউকেই দেখিনি আমি। চেনা তো দূরের কথা। দয়া করে এখন যাও তোমরা।'

'দেখুন, ব্যাপারটা সত্যি আমাদের জন্যে জরুরী,' ছবিটা আবার পকেটে রেখে দিল কিশোর। তারপর আচমকা ঢিল ছুঁড়ে বসল অন্ধকারে। 'মুখ বন্ধ না

রাখলে ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে আপনাকে ডগলাস কেইন, তাই না?'

'বেরোও! বেরোও আমার বাড়ি থেকে!' চিৎকার করে উঠল কেগ।

কিন্তু নড়ল না কিশোর আর মুসা।

'আমরা জানি,' কেগের চিৎকারের পরোয়াই করল না কিশোর, 'জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কি বলো, মুসা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আপনার গাড়িটার মত একটা গাড়ি দিয়ে।'

'আমার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ আনতে চাইছ তোমরা, বুঝতে পারছি না,' গলার জোর হারিয়ে ফেলেছে কেগ। 'সত্যি বলছি, ডগলাস কেইনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, এখানে এ বাড়িতে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে আমি ছবি আঁকি, কেবল খাবার সময়টুকু বাদে। আমি একজন আর্টিস্ট।' তারপর কিশোরদেরকে আর কিছু বলার কিংবা ভেতরে ঢোকার কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভুরু নাচাল, 'কি বুঝলে?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'চলো, গাড়ির নম্বরটা লিখে নিই। চাকার খাঁজের ডিজাইনগুলোও দেখব।'

গাড়ির কাছে এসে নোটবুকে নম্বরটা লিখে রাখল সে। তারপর পেলিক্যান লেন থেকে এঁকে আনা ডিজাইনগুলো বের করে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

'এই দেখো,' মুসাকে দেখাল কিশোর। 'জিনার ফেলে যাওয়া গাড়ির কাছে যে সব দাগ পেয়েছি, তার সঙ্গে একটা দাগ মিলে যাচ্ছে।'

ভ্যানের কাছে ফিরে এল দু'জনে। কি কি জেনে এল, জানাল রবিন আর ইভাকে।

'কেগকে কি মনে হলো?' জিজ্ঞেস করল ইভা।

'বুঝলাম না, ডাকাত দলের সর্দার, নাকি স্পাই,' জবাব দিল মুসা। 'তবে ডগলাসের কথা শুনে চমকে গেছে, এটা ঠিক।'

'তার গাড়িটার দিকে এখন নজর রাখা দরকার,' কিশোর বলল। 'এটাই আসল গাড়িটা কিনা, যেটাকে আমরা খুঁজছি, এ ব্যাপারে এখনও শিওর হওয়া যাচ্ছে না। খুঁজলে ওরকম তিনটে নম্বর মিলে যাবে বহু গাড়ির সঙ্গে। পুরো নম্বরটা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া কঠিন। আর চাকার ডিজাইনও মিলে যাবে লক্ষ গাড়ির সঙ্গে, কারণ কোম্পানি তো আর প্রতিটি চাকারই ডিজাইন বদল করে না। কেগের গাড়ির সঙ্গে এ সব মিলে যাওয়াটা কাকতালীয়ও হতে পারে।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'খুঁজে বের করব কি করে তাহলে?'

'ফোনে কাজটা সারা যেতে পারে,' কিশোর বলল।

'তাহলে দায়িত্বটা আমাকে দিতে পারো,' ইভা বলল। 'বসে বসে যত খুশি ফোন করতে পারব আমি।'

'কোন্ কাজ?' বুঝতে পারল না মুসা।

'গাড়ির সবুজ রঙ আর শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়, এমন ক'টা গাড়ি আছে, রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করে জানার কাজ,' বুঝিয়ে দিল কিশোর।

ইভাকেই দায়িত্বটা দিল সে।

মোটেলের কাছে আসতে কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে আঙ্কেল ব্রুকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।'

সবাই দেখল, পার্কিং লটে একটা দামী বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মুসা গাড়িটা পুরোপুরি থামানোর আগেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গেল ইভা। দৌড় দিল অফিসের দিকে।

তার পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন। গাড়িটা রেখে আসতে সামান্য দেরি হলো মুসার।

অফিসের কাছাকাছি আসতে কানে এল মিস্টার ব্রুকের কণ্ঠ, 'এ জায়গা বিক্রির কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না।'

ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ইভা আগেই ঢুকে পড়েছে। ফিরে তাকাল নীরা লেভিন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার মিস্টার ব্রুকের দিকে ঘুরল।

'ঠিক আছে, নয় লাখ ডলারই দিলাম, যান।' দ্রুত চেক লিখে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল মিস্টার ব্রুকের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। 'খবর শুনেছ? আমার বোটটাও শেষ। মেরিনাতে সরানোর আর সুযোগ হয়নি। স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ। তলা খসে গিয়ে তলিয়ে গেছে পানিতে। কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠল ইভা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। কি বলবে ভেবে পেল না।

মাথা নামালেন মিস্টার ব্রুক। ভগ্ন, বিধ্বস্ত একজন বুড়ো মানুষ। মুখ তুলে তাকালেন আবার নীরার দিকে। 'খুব যে বেশি দিচ্ছ না, সেটা তুমিও জানো। রিসর্ট বানিয়ে এর দশগুণ পয়সা তুলে নেবে খুব সহজেই।' চেকটার দিকে তাকালেন না তিনি।

'দশ কি বলছেন?' না বলে আর পারল না কিশোর। 'বিশ-তিরিশ গুণ এসে যাবে পয়লা দু'এক বছরেই। তার পরেরগুলো তো ফাউ। অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে।'

তাড়াতাড়ি একটা দলিল বের করে বাড়িয়ে দিল নীরা। 'নিন, সই করে দিন।'

'চাচা, খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ইভা। 'সই দেবে না বলে দিলাম!'

'না দিয়ে কি করব, বল্?' ক্লান্ত, শুকনো কণ্ঠস্বর। 'তোরা চলে গেলি। বোটটা খুইয়ে এলাম। এসে দেখি স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর বসে আছে। হুমকি দিয়ে গেছে, আগামী কয়েক সপ্তার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার করাতে না পারি, মোটেলে তালা লাগিয়ে দেবে। বলে গেছে, নতুন আইন নাকি হয়েছে এ ব্যাপারে। কত আর লড়াই করব?'

'দিন, সইটা দিয়ে ফেলুন,' নীরা বলল। 'স্টেট ইন্সপেক্টর অন্যের ঘাড়ে চাপুক।'

'আঙ্কেল ব্রুক,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'সই করার আগে দলিলটা ভালমত পড়ে নিন। প্রয়োজন মনে করলে উকিলকে ডেকে আনুন।'

'এই ছেলে, তুমি থামো!' ধমকে উঠল নীরা। 'বেশি ফড়ফড় কোরো না! আগে আমাদের বেচাকেনা শেষ হয়ে যাক, তারপর যত খুশি পরামর্শ দিয়ো। নইলে খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।'

পাত্তাই দিল না কিশোর। 'আঙ্কেল ব্রুক, একটা ফোন করব।'

হাত নেড়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন মিস্টার ব্রুক।

চলে গেল কিশোর।

ইভা বলল, 'চাচা, দোহাই তোমার, জায়গাটা বিক্রি কোরো না!'

'দেখি তো দলিলটা?' কেউ বাধা দেয়ার আগেই টান মেরে মিস্টার ব্রুকের হাতের নিচ থেকে তুলে নিল রবিন।

'অ্যাই, দেখো!' চিৎকার করে উঠল নীরা। 'ভাল হবে না···'

দলিল সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই রবিনের, তবে ওদের ব্ল্যাক ফরেস্টের বাড়িটা কেনার সময় কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। পড়তে শুরু করল সে।

কলমটা টেবিলে নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন আঙ্কেল ব্রুক। নীরার দিকে তাকাল, 'পড়তে আর আপত্তি কি? পড়ুক না। ভেতরে যদি কোন রকম গণ্ডগোল করে না রাখো, অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

ঠাস করে ব্রীফকেসের ডালা বন্ধ করল নীরা। মুচকি হাসল রবিন। এতটাই প্রতিক্রিয়া হলো নীরার, এমন ভঙ্গি করল, চমকে গিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ইভা।

'বহুত নাক গলাচ্ছ সব কিছুতে!' রবিনের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে লাগল নীরা।

'হুমকি দিচ্ছেন?' রাগ দমাতে পারছে না মুসা।

পাশের ঘরের দিকে তাকাল রবিন। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিশোরকে। ফোনে কথা বলছে। নোটবুকে কি যেন লিখে নিয়ে ফোন রেখে দিল। ফিরে এল অফিসে।

'ব্যুরো অভ কমার্শিয়াল ইন্সপেকশনে ফোন করেছিলাম,' জানাল সে। 'স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর সেজে যে এসেছিল, সে ভুয়া লোক। নভেম্বরের আগে এ মোটেল ইন্সপেকশনে আসার কোন ইচ্ছেই নেই কর্তৃপক্ষের।'

'কিন্তু আইডেনটিটি দেখিয়েছে লোকটা,' বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস্টার ব্রুক।

'ওটাও নকল, দেখুনগে।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নীরা। রাগ দমন করতে পারল না আর। 'এত অল্প সময়ে এত খোঁজ নিতে পারার কথা নয় তোমার। আমি এখন ফোন করলে ঠিক ওরা বলবে, তুমি কোন ফোনই করোনি। তোমাকে চিনতেই পারবে না ওরা।'

'যান, গিয়ে করে দেখুন তাহলে,' সরে জায়গা করে দিল কিশোর।

'নাক গলানো বিচ্ছুর দল!' গালি দিয়ে উঠল নীরা। রবিনের হাত থেকে দলিলটা কেড়ে নিয়ে, টেবিল থেকে চেকটা তুলে ব্রীফকেসে ভরল। তারপর গট্

গট্ করে রওনা হলো দরজার দিকে।

বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল, 'ভেবো না পার পেয়ে যাবে। বাঘের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ তোমরা। এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘাগু লোককে...' কথাটা শেষ করল না নীরা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল মিস্টার ব্রুকের ওপর। পিস্তলের মত তাঁর দিকে আঙুল তাক করে চেঁচিয়ে চলল, 'বুড়ো হাঁদা কোথাকার, সুযোগ দিয়েছিলাম, সদ্ব্যবহার করোনি। এখনও সময় আছে, মনস্থির করে বেচে দাও জায়গাটা। পরে এমন অবস্থা হবে, বেচার মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

আট

নীরা চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। আলোচনা করল ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর কিশোর বলল, 'আজ আর কিছু করার সময় নেই। রেন্টাল কোম্পানির অফিসও নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকালে যা করার করব।'

আগের রাতে ভালমত ঘুমাতে পারেনি, সেদিন তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। মোটেলের অফিসে এসে দেখে কাজে লেগে গেছে ইভা। তাকে সাহায্য করছে রবিন।

'অঘটনের যেন শেষ নেই,' কিশোরকে বলল ইভা। 'কাল রাতে চাচার এক বন্ধু ফোন করেছিল। হিবিসকাস ড্রাইভে থাকে। তার সান-রূমের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে কে নাকি এয়ারকুলারটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। গেকোর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। সে বলেছে কোন দুষ্টু ছেলের কাজ।'

'আহা, পুলিশ অফিসার বটে!' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল।

'তারমানে ওই ভদ্রলোকের জায়গাটার ওপরও নজর পড়েছে ওদের! আর কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।

'এয়ারপোর্টে কার রেন্টাল এজেন্সিতে ফোন করেছিলাম,' ইভা জানাল।

'কোন খোঁজ পেলে?'

'গাড়িটার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলাম, কার কাছে ভাড়া দিয়েছে।'

'কি বলল?' আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর।

রবিনের দিকে তাকাল ইভা। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। হাসল। 'বলেছে, হারম্যান কেগ নামে শিকাগোর এক বীমার দালাল গাড়িটা ভাড়া নিয়ে গাল আইল্যান্ডে গেছে। স্টিকারে লেখা যে সিরিয়াল নম্বরটা দিল, সেটার শেষ তিনটে নম্বরও মিলে গেছে।'

নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে

আনমনে বিড়বিড় করল, 'শিকাগোর একজন বীমার দালাল গাল আইল্যান্ডে এসে ছবি আঁকা শুরু করল কেন?'

'ছবি যে আঁকছে তার কি প্রমাণ?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'ওটা ওর মুখের কথা। নিজের চোখে তো আর তাকে আঁকতে দেখিনি আমরা।'

'আমার মনে হচ্ছে, আরেকবার তার বাড়িতে যাওয়া উচিত আমাদের,' কিশোর বলল। 'আমাদের জানতে হবে জিনা কেন কেগের গাড়ির ছবি তুলেছে।'

'ও হ্যাঁ, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি–বীমার কথায় মনে পড়ল,' ইভা বলল, 'চাচা গেছে মেইনল্যান্ডে। ওখান থেকে ফোন করেছিল। তোমাদের বলতে বলেছে তোমাদের ভ্যানের কাঁচটা সারিয়ে নেবে চাচা। যখন পারো টাকাটা দিয়ো। আর এখানে তার গাড়িটা ব্যবহার করতে বলেছে তোমাদেরকে। ওটার কিছু মেরামতি আছে। তাই নিতে ভরসা পায়নি। রাস্তাঘাটে যদি খারাপ হয়ে যায়। তোমাদেরটাই নিয়েছে।'

'মেইনল্যান্ডে গেছেন কেন? কোন জরুরী কাজ?'

'হ্যাঁ। বোটটার বীমা করানো ছিল। বীমা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে গেছে।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'আমাদের আগেই যদি আঙ্কেল ব্রুক ফিরে আসেন, তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানিও, কাঁচটা ঠিক করে আনার জন্যে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ব্রুকের গাড়িটাতে চড়ল। ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা।

পেলিক্যান লেনে পৌঁছে একটা নির্জন বাড়ির পেছনে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল ওরা। মুসাকে গাড়ির পাহারায় রেখে রবিনকে নিয়ে এগোল কিশোর।

খালি একটা জায়গা পেরিয়ে কেগের বাড়ির দিকে এগোনোর সময় আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ধূসর মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে সকালের সূর্য। সাগরের দিক থেকে আসছে দমকা বাতাস। নুয়ে নুয়ে পড়ছে পাম আর পাইনের মাথা।

'ঝড় আসবে,' কিশোর বলল।

'সুবিধেই হবে তাতে,' রবিন বলল। 'চুরি করে আমরা বাড়িতে ঢুকতে গেলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।'

কেগের বাড়ির পাশের জায়গাটাতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। বড় একটা ঝোপের আড়ালে থেকে বাড়িটাতে চোখ বোলাল।

'গাড়িটা নেই,' রবিনকে জানাল সে।

'কি করব?'

'তুমি এখানেই থাকো। আমি আরও কাছে গিয়ে দেখে আসি।'

'বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না,' সাবধান করে দিল রবিন।

মাথা নুইয়ে এক দৌড়ে বাড়ি আর ঝোপের মাঝের খালি জায়গাটুকু পার হয়ে এল কিশোর। কটেজের একটা বড় জানালার পাশে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে জানালা দিয়ে লিভিং রুমের ভেতরে উঁকি দিল সে। মেঘে ঢাকা আকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে

কাঁচের ভেতর। পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে এখন সূর্য। বেরোচ্ছে না আর। দেখতে দেখতে এতটাই ঘন মেঘ জমে গেছে, সকালটাকে লাগছে সূর্য ডোবা সন্ধ্যার মত।

সাবধানে সরে এসে ডেকে ওঠার দুই ধাপ সিঁড়ির প্রথমটাতে পা রাখল কিশোর। মচ্‌মচ্‌ করে উঠল কাঠের তক্তা। কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল মেঘ ডাকার শব্দে।

দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। মাথার ওপর বাতাসে কাত হয়ে যেন ঝুলে রয়েছে একটা নারকেল গাছের মাথা। দরজার দিকে এগোল সে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। আস্তে করে ঠেলে সেটা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পা টিপে টিপে চলে এল ডাইনিং রুমে। ওখানে দাঁড়িয়ে কান পাতল ভেতর থেকে শব্দ আসে কিনা শোনার জন্যে। ঘরের এক প্রান্তে সিংকের কল খোলা, ক্রমাগত পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না।

কি খুঁজতে এসেছে জানে না সে। কিন্তু খুঁজতে আরম্ভ করল।

কেগ ছবি আঁকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হাত মোটেও ভাল নয়। কতগুলো বাজে ছবি এঁকেছে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বেরোতে যাবে, এই সময় ডাইনিং রুমের টেবিলে একটা পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল। একটা হাতঘড়ি। তুলে নিয়ে উল্টে দেখল। কাজে এতটাই মনোযোগ, বাইরে যে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, শুনতে পেল না।

কিন্তু রবিন ঠিকই শুনেছে। গাড়িটা পেলিক্যান লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ কানে এসেছে তার। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিশোরের জন্যে। ঝোপটার কাছ থেকে সরে এল একটা আঙুরের ঝাড়ের কাছে। চিৎকার করে ডেকে সাবধান করে দেবে কিনা কিশোরকে বুঝতে পারছে না। কাছে চলে এসেছে গাড়িটা। গাড়ির চালকও তার ডাক শুনতে পাবে।

রবিন কিছু করার আগেই ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল সাগরের পানিতে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল। সবুজ গাড়িটার দিকে দৌড় দিল সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কেগ। মুহূর্তে বৃষ্টি বেড়ে গিয়ে মুষলধারে পড়া শুরু হলো।

কেগের হাতে লম্বা কালো একটা জিনিস।

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক। রাইফেল নাকি?

'কেগ!' চিৎকার করে ডাকল রবিন।

গাড়ির কাছে স্থির হয়ে গেল কেগ। রবিনের দিকে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না সে। অর্ধেক ঘুরেছিল, ঝটকা দিয়ে পুরো ঘুরে গেল আবার দরজার দিকে। কারণ কটেজের দরজা দিয়ে ডেকে বেরোতে দেখে ফেলেছে কিশোরকে।

'তুমি!' রাগে চিৎকার করে উঠল কেগ। 'তুমি এখানে কি করছ?'

'কিশোর, সাবধান!' রবিনও চিৎকার করে উঠল। 'ওর হাতে রাইফেল!'

বাজ পড়ল আবার। তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল বাজের শব্দে।

বাজটা পড়ল ডেকের কাছের নারকেল গাছটার মাথায়। মাথাটা চিরে দিল এমন করে, যেন মাখনে ছুরি চালাল। একটা অংশ ভেঙে গেল কাণ্ড থেকে।

ডিগবাজি খেতে খেতে পড়তে লাগল ডেকের ওপর। কিশোর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানে।

নয়

'কিশোর!' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল রবিন। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে গাছের নিচে কুঁকড়ে পড়ে থাকা কিশোরের দেহটার দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। কেগকে ঠেকাতে হবে। মুসা অনেক দূরে। ডাকলেও শুনবে না। শুনলেও লাভ হবে না। ও আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। কেগের পা সই করে ঝাঁপ দিল রবিন। তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

'আরে কি করছ! কি করছ! ছাড়ো না!' চেঁচাতে লাগল কেগ। 'আমার পর্দা টানানোর রডগুলোর সর্বনাশ করে দেবে তো। বাঁকা হয়ে যাবে!'

কেগের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা আঁটি বাঁধা জিনিসগুলোর দিকে ভালমত নজর দিল এতক্ষণে রবিন। 'পর্দা টানানোর রড?' বোকা হয়ে গেছে।

'এক মাস আগে অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম বানিয়ে রাখার জন্যে,' গোঁ-গোঁ করে বলল কেগ।

কেগের ঘ্যানর ঘ্যানরে কান দিল না রবিন। রাইফেল নয় জানার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় দুশ্চিন্তা মগজ থেকে নেমে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কিশোরকে গাছের নিচ থেকে বের করতে হবে।

মুখে যা-ই বলুক, ওকে বের করতে রবিনকে ঠিকই সাহায্য করল কেগ। ধরাধরি করে গাছের মাথাটা সরাল কিশোরের ওপর থেকে। প্রথমে ডেকের ওপরের চালায় পড়েছিল বলে রক্ষা। চালায় পড়ে তারপর কিশোরের ওপর পড়েছে। সরাসরি পড়লে কোমর ভাঙত, কিংবা অন্য কিছু হত। মোট কথা আঘাতটা হত মারাত্মক।

ঘাড়ে সামান্য ব্যথা পেয়ে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। জ্ঞান ফিরতেও সময় লাগল না।

'ভালই আছি আমি,' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল কিশোর। 'ভিজে গোসল করা ছাড়া খারাপ আর কিছুই হয়নি। কাঁধে কিছু আঁচড় আর ছেঁচা লেগেছে, নারকেলের ডগা ধারাল তো...'

ঝাপটা দিয়ে গেল প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস। বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ। ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে ঝড়। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ক্রমাগত কালো মেঘের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুতের লকলকে শিখা।

'এখানে থাকা বিপজ্জনক,' কিশোর বলল। 'বাজটা তখন গাছের মাথায় না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই গেছিলাম।'

'ভেতরে তো যাবই,' এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেল যেন কেগ। 'তবে তার আগে

তোমাকে অ্যারেস্ট করানো দরকার।'

মাটি থেকে রডগুলো তুলে আনল সে। একসাথে বাঁধা ছিল বলে বৃষ্টির মধ্যে দূর থেকে রাইফেলের মত মনে হয়েছে রবিনের কাছে। রাইফেলের মতই উঁচু করে ধরল এখন কেগ। 'বেআইনী ভাবে আমার সীমানায় ঢুকেছ তোমরা। দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকেছ।'

'না, দরজা ভাঙিনি,' প্রতিবাদ জানাল কিশোর। 'দরজাটা খোলাই ছিল।'

'বুঝলাম, হুড়কোটা ভাঙা ছিল। তাই বলে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়বে নাকি? চুরি করতে ঢুকেছিলে?'

'নাহ্,' হাসিমুখে মাথা নাড়ল কিশোর। 'চুরি করার মত কিছু নেই ঘরে। কতগুলো পচা ছবি। ওগুলো কে নেয়।'

কিন্তু কিশোরের রসিকতায় নরম হলো না কেগ। রেগে উঠল, 'তোমাকে আমি পুলিশে দেব!'

ডেকের ওপর উঠে পড়ল আবার কিশোর। বৃষ্টি কম লাগে। 'মিস্টার কেগ, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি যে গাড়িটা চালাচ্ছেন, আমাদের বন্ধুকে কিডন্যাপ করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা।'

'ফালতু কথা বোলো না!' ধমকে উঠল কেগ।

'প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।'

'কি প্রমাণ?'

'ঘটনার সময়কার একটা ছবি। তাতে সহজেই প্রমাণ করা যাবে আপনার গাড়িটাই ব্যবহার করা হয়েছিল।' এক মুহূর্ত থেমে কেগকে খবরটা হজম করার সময় দিল কিশোর। তারপর বলল, 'সুতরাং আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে পুলিশ ডাকলে আমরাও ছেড়ে দেব না আপনাকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেগকে লক্ষ করছে কিশোর।

ডেকে উঠে পড়ল কেগ। সরে গিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।

'আমি কাউকে কিডন্যাপ করিনি।'

'তাহলে কে করেছে?'

'আমি জানি না।'

'আপনার গাড়িটা যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তো ঠিক?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল কেগ, বলবে কিনা দ্বিধা করছে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিল।'

'চুরি!' সমস্বরে বলে উঠল রবিন আর কিশোর।

'হ্যাঁ, পাঁচদিন আগে। সৈকতের ধারে আমি তখন ছবি আঁকছিলাম।'

চুপ করে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'ছবি আঁকা শেষ করে বাড়ি ফেরার জন্যে গাড়ির কাছে গেলাম,' কেগ বলল। 'গাড়িটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে পেলাম না। চাবি আমার পকেটেই ছিল। তারমানে তার ছিঁড়ে বিকল্প উপায়ে স্টার্ট দিয়েছে।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, বিশ্বাস করব কি করে?'

'আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের।'

'হুঁ। গাড়িটা আবার ফেরত পেলেন কি করে?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম কোন ছেলে-ছোকরার কাজ। গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে খানিকক্ষণ চালিয়ে মজা করার জন্যে। কিন্তু থানার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি সামনের চত্বরে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে আমার গাড়িটা। নো-পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করার অপরাধে তাতে একটা টিকেট লাগিয়ে দিয়েছে হেরিং গেকো।'

'তারমানে এমন কোথাও ফেলে গিয়েছিল চোর, যেখানে গাড়ি পার্ক করা বেআইনী,' কিশোর বলল। 'টিকেটটা আছে আপনার কাছে?'

'না,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল কেগ। 'ফাইনের টাকাটা সহ টিকেটটা গেকোর ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি। মেজাজ তখন কি পরিমাণ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল কল্পনা করতে পারবে না। গাড়ি চুরি গেল আমার। হেঁটে শহরে ফিরতে হলো। ফিরে দেখি থানায়, এবং টিকেট লাগানো। কড়কড়ে বিশটা ডলার গচ্চা দিতে হলো। এখানে কি কোন আইন-কানুন আছে!'

'থাকবে। খুব শীঘ্রি।'

'দেখো,' কেগ বলল, 'আমি কোন উৎপাত চাই না। বিশ্বাস করো, কাউকে কিডন্যাপ করিনি আমি। কে করেছে তা-ও জানি না। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, গাড়িটা যে চুরি হয়েছিল আমার, এ কথা ঠিক।'

'ঠিক আছে, করলাম,' কিশোর বলল। 'এখন ডাকুন পুলিশকে। আমাকে অ্যারেস্ট করানোর জন্যে। আপনার কথা আপনি বলবেন। আমাদের কথা আমরা বলব। দেখি পুলিশ কারটা বিশ্বাস করে।'

'বাদ দাও পুলিশ! বিরক্তির চূড়ান্ত হয়ে গেছি আমি। ওই গেকো গিরগিটিটার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওর ছায়া মাড়ালেও ঝামেলা!'

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার কাছাকাছি কোথাও। বিদ্যুৎ-শিখার আকাশ জুড়ে ছুটে বেড়ানোর বিরাম নেই। বজ্রপাতের ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কেগ।

'কি বুঝলে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত থাক বা না থাক, লোকটা কোন কিছু লুকাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

কিশোরের জবাব শুনে চোখ বড় বড় করে তাকাল রবিন।

পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখাল কিশোর। 'চিনতে পারো?'

কয়েকটা সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জবাব দিল রবিন, 'জিনারটা না? জন্মদিনে পারকার আঙ্কেল যেটা দিয়েছিলেন তাকে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেগের ঘরে। টেবিলের ওপর। নিশ্চয় জিনাই রেখে গেছে। এত বেশি

জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে, ওসবের মধ্যে এটা আলাদা করে চোখে পড়েনি কেগের। এখন আমাদের জানতে হবে কেগের সঙ্গে কেইনের সম্পর্কটা কোথায়?'

বৃষ্টির বিরাম নেই।

আকাশের দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'চলো, আর এখানে কোন কাজ নেই। মুসা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ কি করছি আমরা ভেবে।'

দশ

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে শহরে ফিরে চলেছে ওরা।

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ফুল স্পীডে চলছে উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার। বৃষ্টি মেশানো ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা বার বার এসে আঘাত হানছে গাড়ির গায়ে। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে বালির কণা, কুটো-পাতা।

পেলিক্যান আর কারলুর কোণে এনে গাড়ি রাখল মুসা। কুপারের রেস্টুরেন্টের কাছে। খাওয়া দরকার।

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নুইয়ে একদৌড়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে এই সময় দরজায় দেখা দিল ডেপুটি গেকো। ভারিক্কি চালে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের টেবিলের কাছে।

'তোমাদেরকেই খুঁজছি। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে আমার...' কিশোর আর রবিনের কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল গেকো। 'কাদার মধ্যে কুস্তি করে এসেছ নাকি?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বৃষ্টির সময় সাগরকে কেমন লাগে, দেখতে গিয়েছিলাম।'

গোটা দুই হাঁচি দিল গেকো। হাত ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। 'দেখাদেখির কাজ আমিও খানিকটা করে এসেছি। ওয়াইল্ড পাম মোটেলে গিয়েছিলাম। আরেকটা নৌ-দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা।'

'দুর্ঘটনা?' কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। 'ওরা ঘটাবে কেন? ইঞ্জিনের মধ্যে বোমা পেতে রেখে এসেছিল কেউ, স্টার্ট দিলেই যাতে ফাটে।'

'খুব বেশি জেমস বন্ডের ছবি দেখো,' একটা টুল টেনে নিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল গেকো।

'কেন, আপনার কি ধারণা? পেট্রোলের গ্যাস জমে ইঞ্জিনটা উড়ে গেছে?'

'বাস্তব কথা ভাবলে সেটাই স্বাভাবিক,' মহাবিজ্ঞের ভঙ্গিতে জবাব দিল গেকো। 'পুরানো বোট। পুরানো ইঞ্জিন। এ ধরনের ঘটনা তো ঘটতেই পারে।'

'হুঁ, তা তো পারেই,' ফোড়ন কাটল কুপার। 'কিছুদিন ধরে যে হারে "স্বাভাবিক" সব দুর্ঘটনা ঘটছে দ্বীপটাতে, আর কিছুদিন এ ভাবে চললে এর নাম বুক অভ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে উঠে যাবে।'

'ওগুলো যে দুর্ঘটনা নয়, এমন কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে?' খেঁকিয়ে

উঠল গেকো।

'সে-রাতে আমার প্রোপেন ট্যাংকটা যে ফুটো হয়ে গেল, ওটার সঙ্গে যুক্ত টিউবগুলোকে টেনে খুলে বাঁকাচোরা করে ফেলে রাখা হলো, সেটাও নিশ্চয় দুর্ঘটনা?'

'র‍্যাকুনে করেছে,' খোঁচা মারল কিশোর।

'কিংবা অ্যালিগেটরে,' গেকো বলল। 'সারা বছরই জ্বালায় ওগুলো, জানোই তো।'

'তারমানে আপনি বলতে চান, জিনাকেও র‍্যাকুনে কিংবা অ্যালিগেটরে ধরে নিয়ে গেছে?' শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর।

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' টুলের ওপর ঘুরে বসে ওদের মুখোমুখি হলো গেকো। 'ওয়াইল্ড পামে ব্রুকের ভাতিজির কাছে শুনলাম খবরটা।'

'ইভা?' শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর। আবার কোন্ খারাপ খবর শোনাবে!

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গেকো। 'কিডন্যাপিং-ফিডন্যাপিং কিছু না। তোমাদের বান্ধবী এখন মহানন্দে আরেক জায়গার সমুদ্র সৈকতে রোদ পোয়াচ্ছে।'

'কি করে জানলেন?'

'চিঠি পাঠিয়েছে। ওয়াইল্ড পামের ঠিকানায়। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই গিয়ে দেখে এসো।'

খাবার তৈরি হয়ে গেছে। নইলে তক্ষুণি উঠে চলে যেত ওরা। কোনমতে নাকে-মুখে খাবারগুলো গুঁজে, কুপারের বিল মিটিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল তিনজনে।

ওয়াইল্ড পামের সামনে মুসা গাড়িটা রেখেও সারতে পারল না, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড় দিল অফিসের দিকে।

কিশোরকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল ইভা। ড্রয়ার থেকে নীরবে বের করে দিল চিঠিটা। পোস্টকার্ডে লিখে পাঠিয়েছে জিনা।

'জিনার হাতের লেখা, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা আর রবিন। সিল-ছাপ্পর দেখে বলল, 'দু'দিন আগে মিয়ামি থেকে পোস্ট করা হয়েছে।'

'আমাকে না জানিয়ে মিয়ামিতে চলে গেছে জিনা, বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার!' ইভা বলল। 'অথচ আমরা এদিকে...'

'যদি গিয়েই থাকে, ইচ্ছে করে যায়নি, আমি শিওর,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া এটা কিডন্যাপারদের চালবাজিও হতে পারে। ওকে দিয়ে লিখিয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছে লং আইল্যান্ড থেকে নিজে নিজেই মিয়ামিতে চলে গেছে সে। আর যদি জিনাই পাঠিয়ে থাকে, তাহলে কার্ডটা পাঠানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে তার। কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে। খোলা কার্ডে খোলাখুলি লিখলে শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সে-জন্যে ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে। ও লিখেছে: জায়গাটা দারুণ। গতবারের চেয়ে ভাল লাগছে। ইস্, তোমরা থাকলে খুব মজা হত। জিনা।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'বুঝতে পারছ কিছু?'

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল মুসা, 'কিচ্ছু না। অতি সাধারণ একটা চিঠির মতই লাগছে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি বুঝেছ?'

ভাবছে রবিন। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখচোখ। 'গতবার মিয়ামিতে যায়ইনি সে! লং আইল্যান্ডে গিয়েছিল!'

'ঠিক,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'এটা দিয়েই বোঝাতে চেয়েছে যে যা লিখেছে, তার অন্য অর্থ আছে। কার্ডের ছবিটার ক্যাপশন লিখেছে দেখো: মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না।' চোখের পাতা সরু করে তাকাল কিশোর। 'এর মধ্যেও সূত্র আছে নিশ্চয়। ছবিটার কোন মানে না-ও হতে পারে অবশ্য। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য কিংবা ডলফিনের ছবিওয়ালা কার্ড পেলেও হয়তো তাতেই লিখত।'

'কি জানি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে কপাল চুলকাল রবিন। 'সূত্রের পর সূত্র দিয়ে যাচ্ছে জিনা। গাড়ির ছবি, কেইনের বাড়িতে ফ্রিজে তার বাবার ছবি, কেগের বাড়িতে ঘড়ি, এখন এটা! তারপরেও এগোতে পারছি না আমরা!'

'আজ রাতে কেইনের বাড়িতে ঢুকব আমরা, পার্টির সময়,' কিশোর বলল। 'পুরো বাড়িটাতে খুঁজব। যদি ওখানে জিনাকে না পাই, তাহলে শিওর হয়ে যাব, ওকে মিয়ামিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমুদ্রতীরের কোন বাড়িতে আটকে রেখেছে। মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না–কথাটা লেখার এই একটাই অর্থ হতে পারে!'

এগারো

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। সকালের মত নেই আর। তবে আকাশে ভারী মেঘ জমে আছে এখনও। যে কোন সময় আবার শুরু হবে।

কেইনের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল মুসা। সে আর কিশোর এসেছে। রবিনকে রেখে এসেছে মোটেলে, ইভার সঙ্গে। কেইনের বাড়িতে ঢুকলে বিপদ ঘটার একশো ভাগ সম্ভাবনা। সবাই আটকা পড়লে উদ্ধারের উপায় থাকবে না আর। রবিনকে রেখে এসেছে সে-কারণে। বলে এসেছে, রাত বারোটার মধ্যে ফিরে না গেলে প্রথমে যেন মিয়ামি পুলিশের কাছে যায় রবিন, কারণ ডেপুটি হেরিং গেকোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তারপর রকি বীচে ফোন করে ওমর ভাইকে।

কারলু রোডে সারি সারি নানা ধরনের চকচকে গাড়ির পেছনে ভ্যানটা রাখল মুসা। একপাশে কেইনের বাড়ির দেয়াল। ওটা ঘেঁষে রাখা হয়েছে গাড়িগুলো।

বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে হাসি আর বাজনার শব্দ।

সাগরের দিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে যেন ঘন কুয়াশা। ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিতে হয়েছে কেইনকে। তারপরেও সুবিধে হচ্ছে না। বাড়িটার খুব সামান্য

জায়গাই স্পষ্ট হয়েছে তাতে। স্বস্তিই বোধ করছে কিশোর। কুয়াশার মধ্যে গাছপালার ভেতরে সহজে ওদেরকে চোখে পড়বে না।

পার্টির উপযুক্ত পোশাক পরে এসেছে দু'জনে। উল্টোপাল্টা পোশাকে এসে মেহমানদের নজরে পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে সহজেই। কিশোর পরেছে স্পোর্ট কোট আর স্ল্যাকস। মুসা গায়ে দিয়েছে উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টওয়ালা শার্ট। পরনে জিনস।

ভেতরে ঢোকার আগে শেষবারের মত সাবধান করল কিশোর, 'দেখো, কারও সন্দেহ হয়, এমন আচরণ কোরো না। সবাই যাতে ভাবে আমরাও দাওয়াত পেয়েই এসেছি।'

হাসল মুসা, 'তা করব না। তবে সামনে খাবার পড়ে গেলে খানিকটা তো চেখে দেখতেই হবে, কি বলো? না খেলেই বরং গেস্টরা সন্দেহ করবে।'

'কোন রকম ঝুঁকি নেবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।'

ড্রাইভওয়ে ধরে আগে আগে হেঁটে চলল কিশোর। পেছনে মুসা।

সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। কিন্তু তাদের কাউকেই কেইনের দুই সহকারীর মত লাগল না। মেহমানই হবে ওরা।

সামনের হলঘরে ঢুকে লোকজন দেখে ফিসফিস করে কিশোরের কানের কাছে বলল মুসা, 'দু'শো জনের কম হবে না।'

'এনডি আর কোরির ব্যাপারে সতর্ক থাকো,' কিশোর বলল।

'কোথায় ওরা? দেখছি না তো।'

'এখানে দেখা যাচ্ছে না বলে যে বাড়িতে নেই, সেটা ভাবা ঠিক হবে না।' ওখানে দাঁড়িয়েই হলঘর আর লিভিং রুমের সমস্ত জায়গায় চোখ বোলাল কিশোর। 'নীরা লেভিনের সামনেও পড়া চলবে না আমাদের।'

রান্নাঘরের দিকে এগোল দু'জনে। চারপাশে নজর রাখতে লাগল মুসা, কিশোর এগিয়ে গেল রেফ্রিজারেটরটার দিকে।

ছবিগুলো ভালমত দেখে এসে বলল, 'ছবিটা নেই।'

'সরিয়ে ফেলল নাকি?' রেফ্রিজারেটরটার দিকে তাকাল মুসা। 'সবই ঠিকঠাক আছে, কেবল ছবিটা সরিয়েছে।'

'তারমানে নজরে পড়ে গেছে ওদের,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে খুঁজতে থাকি আমরা। জিনা এ বাড়িতে আছে কিনা, বোঝা দরকার। থাকলে কোথায় আছে জানতে হবে। তুমি এই তলাতেই খোঁজো, আমি দোতলায় যাচ্ছি। ফোন বেজেছিল ওখানে, মনে আছে? কেইনের অফিস-টফিস থাকতে পারে।'

সিঁড়ির দিকে এগোল সে। কে যেন ডেকে বলল তাকে, 'আই, কোথায় যাচ্ছ? কেইন এখনই চলে আসবে।'

'তাঁর একটা মেসেজ আছে, সেটাই দিতে যাচ্ছি,' ফিরে তাকাল না কিশোর। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। দ্রুত ভাবনা চলেছে মগজে। একটা সেকেন্ডও আর দেরি না করে একেক লাফে কয়েকটা করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে এল।

শূন্য হলঘর। ডানে ঘুরল সে। শেষ মাথায় চলে এল। তিনটে বেডরুম আর একটা বাথরুম পেরোল। ওগুলোতেও কেউ নেই।

মুসা তখন লিভিং রুমের এক মাথার দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ মাথার হলে এসে পৌঁছল। ওটা ধরে এগোলে মস্ত একটা বাথরুম, গোটা দুই বেডরুম আর একটা বসার ঘরে যাওয়া যায়।

একটা বেডরুমে ঢুকে বড় একটা দেয়াল আলমারি খুলে দেখল। বাথরুমে খুঁজল। নেই কেউ। ঘরটাও কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হলো না।

দ্বিতীয় বেডরুমটাও প্রথমটার মতই। তবে আলমারিটা একেবারে খালি নয়। ছোট একটা বাক্স পাওয়া গেল। তাতে জাপানী ভাষায় কি যেন লেখা। তার ভেতরে কতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দেখা গেল। ডায়োড, ট্র্যানজিস্টর, কম্পিউটারের চিপস এ সব জিনিস।

শেষ ঘরটায় বড় একটা টেবিলে প্রচুর জিনিসপত্র ছড়ানো। তার মধ্যে লাল একটা সানগ্লাস দেখতে পেল সে। জিনিসটা পরিচিত মনে হলো। অবিকল এ রকম একটা সানগ্লাস আছে জিনার।

তুলে নিয়ে পকেটে ভরতে যাবে ঠিক এই সময় দরজার কাছ থেকে শোনা গেল এনডি টাওয়ারের কণ্ঠ, 'অ্যাই, কে তুমি?

সানগ্লাসটা প্রথমে পকেটে ভরল মুসা। তারপর আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি একজন গেস্ট!'

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল এনডি। 'আবার ঢুকেছ এখানে!'

খেপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ছুটে গেল মুসা। মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল এনডির পেটে। ওর ভয়ানক শক্ত খুলির এ রকম আঘাতে বাঘ কাবু হয়ে যাওয়ার কথা, আর এনডি তো মানুষ হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। মেঝেতে পড়ে গেল সে।

কোন দিকে আর না তাকিয়ে হলরুম ধরে দৌড় মারল মুসা।

ওপরতলায় কিশোর তখন এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জিনার কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না তার।

হল পার হয়ে বাঁয়ে ঘুরল। বাকি আছে দুটো ঘর। ওগুলো দেখা হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে। হলের শেষ মাথার দিকে পা বাড়াল সে। কানে এল একটা শীতল কণ্ঠ, '...আরে না, এখন না! আমি আগে আসি। পার্টি শেষ হলেই রওনা দেব। কি বললাম, বুঝেছ?'

ডগলাস কেইনের গলা চিনতে পারল কিশোর।

পা টিপে টিপে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কান পাতল দরজায়।

'তোমার কাজ হলো,' তীক্ষ্ণ হয়ে যাচ্ছে কেইনের গলা, 'আমি যা বলি অক্ষরে অক্ষরে শুনবে। কমও না, বেশিও না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর চেঁচিয়ে উঠল কেইন, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?' ফোনে কথা বলছে সে, বোঝা গেল। 'আমি বলছি আমি এসে যা করার করব। দেখে যেন দুর্ঘটনা মনে হয়। সেজন্যেই তো ওদের খবর দিতে বললাম তোমাকে। দিয়েছ, না তা-ও দাওনি?'

গভীর আগ্রহে দম বন্ধ করে শুনছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে, ওদের কেসটার সঙ্গে এ সব কথার কোন সম্পর্ক আছে।

'আরে গাধাটাকে তো কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছে না!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল কেইন। 'তোমার কি ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ লোকের মাথায় তোমার মত গোবর পোরা? তুমি গায়েব করে দেবে, আর সবাই একবাক্যে বলবে—আহা, আহা, গায়েব হয়ে গেল! কেউ কোন খোঁজ নেবে না? এখন বুঝতে পারছি ড্যাগো কেন তোমাকে আমার কাজ করতে পাঠিয়েছে। পাঠিয়ে আসলে জানে বেঁচেছে। তোমার হাঁদাপনা ও আর সহ্য করতে পারছিল না। দেখো, পিকো, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি ড্যাগোর মত তোমাকে আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব না। আমাকে খুশি করতে পারলে ভাল, না পারলে কানটা ধরে বের করে দেব। আর আমি যাদের বের করে দিই, পরে তাদের কি হয় জানো তো? হয় অ্যালিগেটরের পেটে যায়, নয়তো হাঙরের খাবার হয়। এইমাত্র তুমি যে পদ্ধতিতে গায়েব করতে চাইলে।'

দড়াম করে ফোনটা রেখে দিল কেইন। এত জোরে আছাড় দিয়ে রাখল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল কিশোর।

নিচতলার চেঁচামেচি মনোযোগ ারিয়ে নিল তার। হট্টগোলটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। কেইনের কানেও যাবে নিশ্চয়। দেখতে বেরোতে পারে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও লুকিয়ে পড়ার আগেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল কেইন। কিশোরকে দেখে ফেলল।

'অ্যাই! কে, কে!' চিৎকার করে উঠল কেইন। 'ও, তুমি! এনডি! কোরি! জলদি এসো!' দৌড়ে এসে কিশোরের কোট চেপে ধরল সে।

কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। দৌড় মারল কিশোর। হ্যাঁচকা টান লেগে কাপড় ছিঁড়ে গেল। ফিরেও তাকাল না সে। সিঁড়ির দিকে ছুটল। কানে আসছে কেইনের চিৎকার। লোকজন ডাকছে সে।

জমে উঠেছে পার্টি। কিন্তু হট্টগোল যেন চরমে পৌঁছাল হঠাৎ করেই। ব্যাপারটা ভাল লাগল না কিশোরের।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!' কানে এল চিৎকার।

প্রথমে ভাবল, তার কথাই বলা হচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখে বুঝল অন্য কারও কথা বলছে। জানালার বাইরে চোখ পড়তে দেখল লন ধরে সৈকতের দিকে ছুটে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি। কুয়াশার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

মুসা!

পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে এনডি। বিপদে পড়ে গেছে মুসা।

বিপদে কিশোর নিজেও পড়েছে।

'থামাও! থামাও ওকে!' সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল কেইনের চিৎকার।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে গেস্টদের ওপর নজর বোলাল একবার কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সবাই বোঝার চেষ্টা করছে গণ্ডগোলটা কোথায়।

কিন্তু কিশোরকে তাড়া করতে গিয়ে যখন দু'জন গেস্টকে ধাক্কা মেরে একটা

কাঁচের বাক্সের ওপর ফেলে দিল কেইন, হাসির হুল্লোড় উঠল।

হাসিটা থেমে গেল গুলির শব্দে।

ঝট করে একটা টেবিলের আড়ালে বসে পড়ল কিশোর। পরক্ষণেই বুঝল, গুলিটা তাকে লক্ষ্য করে করা হয়নি। শব্দ এসেছে বাইরে থেকে। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তায় বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজা লক্ষ্য করে দিল দৌড়।

মুসা তখন সৈকতে পৌঁছে গেছে। আলগা বালি মাড়িয়ে ছোটা ভীষণ কঠিন। এগোনোও যায় না। তা ছাড়া অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে হয়।

পেছনে তাড়া করে আসছে এনডি। বালিতে সে-ও দৌড়াতে পারছে না ঠিকমত। কিন্তু তার হাতে পিস্তল আছে। আরেকবার গুলি করল সে।

মুসার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি।

চিৎকার করে উঠল এনডি, 'থামো বলছি! পরের বার কিন্তু মাথা সই করে মারব!'

মুসা বুঝল, দু'বারই ইচ্ছে করে মিস করেছে এনডি। তাকে থামানোর জন্যে।

লাফ দিয়ে চত্বরে নেমে মুসারা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল কিশোর। সামনে লনের মধ্যে চেয়ার পাতা। সরানোর সময় নেই। লাফ দিয়ে একটা চেয়ার পেরোল।

কিছুদূর এগোতেই দেখল, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি মুসা। দাঁড়িয়ে গেছে। পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে এনডি। নিশ্চয় পিস্তলের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়েছে মুসাকে।

পেছন থেকে এনডিকে কাবু করতে ছুটল কিশোর। কিন্তু তার পেছনেও লোক লেগে গেছে। কোরি ছুটে আসছে ধরার জন্যে। তার পেছনে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে কেইন।

ছুটতে ছুটতেই ফিরে তাকাল একবার কিশোর। বুঝল, আর ছুটে লাভ নেই। ধরা পড়ে গেছে। কারণ, কেইন আর কোরি–দু'জনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

তা ছাড়া, কুকুরগুলোকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাঘের মত গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে ওগুলো।

বারো

কজওয়ে ধরে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

তারপর যে রাস্তাটা ধরল, দেখেই বুঝতে পারল কিশোর, ফ্লোরিডার বিখ্যাত অ্যালিগেটর অ্যালি'র দিকে যাচ্ছে।

মুসাকে জানাল সে-কথা।

বিড়বিড় করে মুসা বলল, 'এত রাতে অ্যালিগেটরগুলো এখন ঘুমিয়ে থাকলেই বাঁচি।'

'অ্যাই, চুপ! কোন কথা নয়,' সামনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধমক দিল কোরি।

গাড়ি চালাচ্ছে এনডি।

পেছনের সীটে হাতকড়া লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে মুসা আর কিশোরকে। হাতকড়ার একটা মাথা হাতের কব্জিতে, অন্য মাথা গাড়ির ফ্রেমে আটকানো। কোনমতেই ছুটানো সম্ভব নয়, একমাত্র চাবি ছাড়া। কাজেই ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা না করে চুপচাপ সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইল দু'জনে।

সৈকত থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বাগানের একটা ছাউনিতে আটকে রাখা হয়েছিল ওদের। গেস্টরা যাতে না দেখে। নিশ্চয় ওদের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দিয়েছে কেইন, দুটো চোর ঢুকেছিল চুরি করতে। পালিয়ে গেছে।

পার্টির পর গাড়িটাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদের। দ্বীপের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। জিনাকেও বোধহয় এ ভাবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেইনের গাল আইল্যান্ডের বাড়িতে যে নেই জিনা, এ ব্যাপারে শিওর এখন ওরা। তবে নেয়া হয়েছিল ওখানে, তার প্রমাণ রেফ্রিজারেটরে লাগানো ছবিটা, আর টেবিলে রাখা চশমা। হয়তো ওঘরেই প্রথমে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে। সে-জন্যেই চশমাটা ফেলে আসতে পেরেছে।

চলতে চলতে গাড়ির গতি কমে গেল হঠাৎ। কারণটা জানার জন্যে দু'জনেই বাইরে তাকাল ওরা। অতি সরু একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এনডি। দুই পাশেই বিশাল জলাভূমি। অন্ধকারে পানি চেনা যাচ্ছে না। তবে আছে। ওগুলোতে কোন্ কোন্ প্রাণীর বাস, কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর। জোঁক আছে। নানা ধরনের বিষাক্ত কীটপতঙ্গ আছে। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যালিগেটর। কোন মতে যদি চাকা পিছলে ওই জলায় গিয়ে পড়ে গাড়িটা, আর উঠতে পারবে না। ভয়াবহ কাদায় আটকে যাবে। পুরোটা যদি ডুবে যায়, তাহলে জ্যান্ত কবর হবে। আর যদি না যায়, অ্যালিগেটরের খাবার হবে।

এটা কোরি কিংবা এনডির না জানার কথা নয়। তাহলে এ পথ ধরল কেন ওরা? নিশ্চয় পুলিশের ভয়ে। সামনে সম্ভবত চেক পোস্ট জাতীয় কিছু আছে। দুটো ছেলেকে গাড়ির পেছনে হাতকড়া লাগিয়ে কেন আটকে রাখা হয়েছে, অবশ্যই জানতে চাইবে ওরা। সে-সব এড়ানোর জন্যেই এই নির্জন বিপজ্জনক রাস্তা ধরেছে এনডি।

অতিরিক্ত সাবধান থেকেও চাকা সোজা রাখতে পারছে না সে। বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে থাকার কারণে। সামনের ডান পাশের চাকাটা মূল রাস্তা থেকে সরে গেল কাঁচা মাটিতে। প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে কাত হয়ে গেল গাড়ির একপাশ।

'শক্ত হয়ে বসে থাকো! নড়বে না কেউ!' চিৎকার করে উঠল এনডি। স্টিয়ারিং চেপে চাকাটাকে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল।

মুক্ত হাতটা দিয়ে সামনের সীটের পেছনটা খামচে ধরল কিশোর। টের পাচ্ছে, উঠে আসার বদলে ক্রমশ রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে চাকাটা।

আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরে গেলেই শেষ। কোনমতেই আর তোলা যাবে না। জলাভূমিতে পড়ে যাবে গাড়ি।

শেষ চেষ্টা করল এনডি। লো গীয়ারে দিয়ে গ্যাস পেডাল পুরো চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে। একই সঙ্গে গায়ের জোরে যতটা সম্ভব বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিতে লাগল স্টিয়ারিং।

সাংঘাতিক ঝাঁকি। আরও কয়েক ইঞ্চি পিছলে গেল চাকা। তবে সামনে না গিয়ে সরে যেতে লাগল বাঁ পাশে। উঠে চলে আসতে শুরু করল। আর গোটা কয়েক ঝাঁকুনি আর চাকা পিছলানোর পর রাস্তায় উঠে এল পড়ে যাওয়া চাকাটা।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছল এনডি।

গাড়ির আরোহীরা আবার স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে শুরু করল।

আর কোন অঘটন ঘটল না। রাস্তাটা নিরাপদেই পার হয়ে এল গাড়ি। বড় রাস্তায় উঠল। যেন ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি ছোটাল এনডি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক গাড়ি ছোটানোর পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। মিয়ামিতে অনেক আগেই ঢুকে পড়েছে। এখন কোথায় এল, সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারল কিশোর। বিসকেইনি বে।

প্রচুর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

আরও কয়েক মিনিট চলার পর বড় একটা দেয়াল ঘেরা বাড়ির গেটের কাছে এসে থামল গাড়ি। ভেতরে গাছপালা, ঝোপঝাড়ের প্রায় জঙ্গল হয়ে আছে।

কাউকে গেটের কাছে আসতে দেখা গেল না। অথচ খুলে গেল গেটটা।

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'ভূতের বাড়ি নাকি?'

গাড়ি ঢোকাল এনডি। লম্বা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে সুদৃশ্য একটা গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল চত্বরের একপাশে। বেশ খানিকটা দূরে, সীমানার উত্তর প্রান্তে সিমেন্টে বাঁধানো বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা হেলিকপ্টার। চিনতে পারল কিশোর। কেইনের হেলিকপ্টারটা। তারমানে ওদেরকে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে হেলিকপ্টারে করে এসে বসে আছে।

কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল গাড়িটা। একটা বড় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। হাতে ছোট রিমোট কন্ট্রোলের মত একটা যন্ত্র। গেটের দিকে তুলে বোতাম টিপতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গেটের পাল্লা।

মুসার ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে খোলে, বন্ধ হয় গেটটা।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। নিচু হয়ে তাকাল। গাড়ির ভেতরটা দেখল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করল এনডিকে।

গাড়ি-বারান্দার সামনে এনে গাড়ি রাখল এনডি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে নামল। তার আগেই নেমে পড়েছে কোরি। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে দিল কিশোরের হাতকড়া। এনডির হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। মুসার হাতকড়াও খুলে দেয়া হলো। তারপর দু'জনকেই বেরিয়ে আসতে বলা

হলো।

মুসা আর কিশোর দু'জনের পিঠেই পিস্তল ঠেসে ধরে ঘরে ঢোকানো হলো।

বিশাল বড় হলঘর। দুই পাশের দেয়াল ঘেঁষেই দুটো মস্ত মাছের ট্যাংক রাখা। পাঁচশো গ্যালন পানি ধরে একেকটাতে।

'আপনার বস্ মনে হয় পুঁটি মাছ খুব পছন্দ করে?' একটা ট্যাংক দেখিয়ে এনডির সঙ্গে রসিকতা করল কিশোর।

'তা তো করেই,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল এনডি। 'বাঁয়েরটাতে আছে একটা স্টিং রে। আর ডানেরটাতে কয়েক ডজন পিরানহা।'

'বাপরে, সাংঘাতিক হবি তো। খুনে মাছ পোষে।'

'খুনে জিনিসই আমার পছন্দ,' কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ছায়ার মধ্যে থেকে লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে এল ডগলাস কেইন। 'পিতপিতে মাছ পুষে মজা নেই। ঠিকমতই তাহলে আনতে পেরেছ, এনডি। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। যা পিছলা না এগুলো। ভয় পাচ্ছিলাম পালিয়ে না যায়।'

'নাহ্, যাবে কোত্থেকে,' জবাব দিল কোরি। 'হাতকড়া খোলা কি আর অত সহজ।'

কথাবার্তা শুনে পাশের লিভিং রূম থেকে বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা এক লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখটা কেমন চারকোনা। বড় বড় দাঁত। কাছে এসে দাঁড়াল। মুসা আর কিশোরের আপাদমস্তক দেখে বলল, 'এই দুটো ছেলেই এত নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছিল তোমাদের?'

হাসল কেইন। 'অত সহজ মনে কোরো না ওদের। খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। কি জেনেছি জানো? শুনলে ভাল লাগবে না তোমার। ওরা কারও পেছনে লাগলে তার সর্বনাশ না করে ছাড়ে না। কেউ রেহাই পায়নি ওদের হাত থেকে।'

'এতটাই···!' কথাটা শেষ করল না লোকটা। এক ভুরু উঁচু করল।

'কিশোর, এর নাম রাগবি ড্যাগো,' পরিচয় করিয়ে দিল কেইন।

শুরু থেকেই লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিশোর। কিছু মনে করার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল কোথাও দেখেছে একে। নাম শোনার পর বুঝল কোথায় দেখেছে। পত্রিকায়। ছবি।

'আপনিই ফ্লোরিডার সেই কুখ্যাত গ্যাং লীডার নন তো?' কিশোর বলল। 'বহুবার পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। সারা আমেরিকার পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।'

'তুমি জানলে কি করে?' অবাক হলো ড্যাগো।

'জানি বলেই তো গোয়েন্দাগিরি করতে পারি,' জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর।

'কি বুঝলে?' ড্যাগোর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কেইন। 'বলেছিলাম না, ডেঞ্জারাস ছেলে ওরা। নাম শুনেই চিনে ফেলল তোমাকে। খোঁজ-খবর রাখে। তবে যত বিপজ্জনকই হোক, এবার আর ওদের মুক্তি নেই।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'এনডি, ওদেরকে আমার জলজ প্রাণীগুলো দেখিয়ে আনো। গরমও যা পড়েছে আজ। মিয়ামির পচা গরম। ইচ্ছে করলে গোসল করার জন্যে পুকুরেও

নামিয়ে দিতে পারো।'

দাঁত বের করে হাসল কোরি। এনডিও হাসল। পিস্তল দেখিয়ে ইশারা করল দুই গোয়েন্দাকে। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগোতে বাধ্য করা হলো ওদের। তবে তার আগে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে নেয়া হলো দু'জনেরই।

ওদিক দিয়েই ঢুকতে দেখা গেল নীরা লেভিনকে। ওকে দেখামাত্র পিস্তল লুকিয়ে ফেলল দুই গুণ্ডা। কিশোর আর মুসার পেছনে এমন করে গা ঘেঁষে দাঁড়াল যাতে ওদের বাঁধন দেখতে না পায়।

থমকে দাঁড়াল নীরা। 'ওরা এখানে কি করছে?'

দ্বিধা করল এনডি। 'কি-কিছু না, ম্যা'ম।...মিস্টার কেইনের অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে চাইল...'

'ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এল কেইন। 'একটু পরেই চলে যাবে ওরা।' নীরার হাত ধরে টান দিল সে। 'এসো।'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে নীরা। 'শত্রু থেকে বন্ধু হয়ে গেল কি করে হঠাৎ? তোমার চাকরি নিয়েছে নাকি?'

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেইনের কণ্ঠ। 'এখন যেতে দাও।'

'এগোও,' কিশোরকে ধাক্কা দিল এনডি।

বাইরে দুটো বিশাল সুইমিং পুলের কাছে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো।

'সাঁতার কাটতে বলবেন নাকি?' সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করল মুসা, 'সুইমিং সুট তো ফেলে এসেছি, ভুলে।'

'কোন অসুবিধে নেই,' হেসে জবাব দিল কোরি। 'অনেক আছে আমাদের। ক'টা লাগবে?'

কিশোর লক্ষ করল একটা পুলেও ডাইভিং বোর্ড নেই। পাড়ের চারপাশ ঘিরে মোটা শিকলের বেড়া। অনেক নিচে পানি।

বেশ কিছুটা দূরে বোট হাউস আর জেটি। জেটিতে বাঁধা একটা সাদা বোট। চ্যানেলের বাইরে খোলা সাগরে একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে। বেআইনী কাজ-কারবার করে রাজার হালেই আছে কেইন আর ড্যাগো। হেলিকপ্টার, ইয়ট, কোন কিছুরই অভাব নেই।

কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো লাগাল মুসা। 'কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ?'

পুলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল আবার কিশোর। বিশাল একটা ত্রিকোণ পাখনা ভেসে উঠেছে একটা পুলের পানিতে। মসৃণ গতিতে ঘুরতে লাগল পুলের কিনার ঘেঁষে।

হাঙর!

হোয়াইট শার্ক!

মানুষখেকো বলে ভয়ানক বদনাম আছে এগুলোর।

আপনাআপনি দ্বিতীয় পুলটার দিকে নজর চলে গেল কিশোরের। ওটাতেও কি হাঙর আছে?

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই হেসে বলল কোরি, 'ওটাতে কি আছে, ভাবছ, তাই না? যাও, নিজের চোখেই দেখো।'

দ্বিতীয় পুলটার কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। ছোট একটা বাক্সের ভেতরে রাখা সুইচ টিপে দিল এনডি। পানি নিরোধক আবরণে মোড়া বাল্ব জ্বলে উঠল পুলের নিচে। একবার তাকিয়েই শিউরে উঠল কিশোর। মস্ত দুটো অ্যালিগেটর শুয়ে আছে পানির তলায়। আলো দেখে নড়েচড়ে উঠল দানব দুটো। বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকাল একটা। ভঙ্গিটা মোটেও ভাল লাগল না ওর। জানোয়ারগুলো হয়তো ভেবেছে, খাবার নিয়ে আসা হয়েছে।

মনে হয় না মানুষের মাংসে এদেরও অরুচি আছে।

তেরো

কোন একটা পুলের পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে ওদের—ভাবছে কিশোর। যেটাতেই ফেলা হোক, ফলাফল সমান। পাড়ের এত নিচে পানি, কোনমতেই হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না। ধরে উঠতে পারবে না—যদি ওঠার সময় পায়, যদি তার আগেই ছিন্নভিন্ন করে না ফেলে ওদেরকে ভয়াবহ জানোয়ারগুলো।

ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষাতেই আছে সে আর মুসা। মনে মনে বাঁচার উপায় খুঁজছে।

নড়ে উঠল মুসা।

'উঁহুঁহু!' সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের খোঁচা মারল তার পাঁজরে এনডি। 'ওসব করে কোন লাভ হবে না। ফুটো হওয়া রক্তাক্ত লাশটা তখন ফেলে দেব পুলের পানিতে। হজম করে ফেলবে অ্যালিগেটরেরা।'

ঘড়ি দেখল কোরি। তারপর বলল, 'আসলে, এখুনি তোমাদের মারা হবে না। বসের নির্দেশ নেই। একটু ভয় দেখানো হলো কেবল। তবে বাড়াবাড়ি করলে ভয়টা সত্যে পরিণত হবে, মনে রেখো।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকলে মুক্তির সুযোগ থাকবে। জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চান আমাদের নিয়ে?'

খিকখিক করে হাসল কোরি। 'আমাদের বস্ খুব মজার লোক। এসো, দেখাচ্ছি তোমাদের।'

সাগরের উল্টো দিকে বনে ঘেরা একটা জায়গায় ওদের নিয়ে আসা হলো। গাছপালার ভেতরে এক টুকরো খোলা জায়গা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মস্ত একটা তাঁবু। এত বড়, একটা দোতলা বিল্ডিং অনায়াসে ঢেকে দেয়া যাবে ওই তাঁবু দিয়ে।

'খাইছে! এটা কি জিনিস?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'সার্কাস দেখাবে নাকি?'

'তাই মনে হচ্ছে?' হেসে বলল কোরি। 'সার্কাসের তাঁবু নয়। এটা আমাদের

অস্থায়ী গুদাম। বনের মধ্যে বড় বেশি পোকামাকড়ের আড্ডা। খুব জ্বালায়। বেশি বেড়ে গেলে গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলা হয় ওগুলোকে। তাতে পোকাও মরে, জিনিসপত্রও নষ্ট হয় না।'

'এখন পোকামাকড় বেড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোকা মারার গ্যাস ছাড়া হবে তাঁবুটাতে,' কোরির কথার খেই ধরল এনডি, দারুণ মজা পাচ্ছে যেন বলতে। ধাতব দুটো সিলিন্ডার দেখাল। তামার একটা 'টি'-এর মত সরু পাইপ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে সিলিন্ডার দুটোর মুখ। টি'র ছোট দুটো মাথা সিলিন্ডারে লাগানো, লম্বা মাথাটা চলে গেছে তাঁবুর নিচ দিয়ে ভেতরে। 'তাঁবুর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে বাতাস আটকে যাবে।' ক্যানভাসের লম্বা লম্বা বেলুনের মত কতগুলো জিনিস দেখাল সে। 'তখন এগুলো দিয়ে তাঁবুর কানাগুলো মাটির সঙ্গে চেপে রাখা হবে।'

'হট ডগ তো মনে হচ্ছে না এগুলোকে,' মুসা বলল।

'বাহ্, এ সময়েও খাবারের চিন্তা,' এনডি বলল। 'সত্যি তোমার স্নায়ু ভীষণ শক্ত। না, হট ডগ নয়। এগুলোকে আমরা বলি স্যান্ড স্নেক। কানাগুলোকে এ জিনিস দিয়ে চেপে দিলে এক বিন্দু গ্যাসও আর বেরোতে পারে না।'

'আর ভেতরে যারা থাকে,' এনডি থামতেই কোরি বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে খতম। জ্যান্ত কোন প্রাণীই আর এরপর বেঁচে থাকতে পারে না।'

'কি জিনিস রাখা হয় তাঁবুটাতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসল এনডি। 'কি জিনিস? ধরো স্মাগলিঙের মাল। দেখবে নাকি? এসো।'

তাঁবুর দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওদের। নানা আকারের প্রচুর বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরে। বেশির ভাগ বাক্সের গায়েই বার্মিজ আর থাই ভাষায় লেখা দেখতে পেল কিশোর। তার মনে পড়ল, ওই দুটো দেশ, বিশেষ করে মিয়ানমার হলো হেরোইন চোরাচালানিদের স্বর্গরাজ্য। তারমানে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে কেইন।

তাঁবুর মধ্যে কাঠের তৈরি একটা কেবিন দেখা গেল। ওটাও অস্থায়ী। তবে লোহার ফ্রেম দিয়ে এমন করে নাট-বল্টু লাগিয়ে আটকানো, বেশ মজবুত, বোঝা যায়। দরজার বাইরের দিকে লাগানো লোহার চ্যাপ্টা ডাণ্ডাটা খুলে দিল কোরি। আড়াআড়ি লাগিয়ে দরজা আটকে রাখা হয়েছিল। টান দিয়ে পাল্লা খুলল। তারপর দু'জনকে ঠেলে দিল দরজার অন্যপাশে। পরক্ষণে আবার পাল্লা লাগিয়ে ডাণ্ডা তুলে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'দেখি, ঘোরো তো,' মুসা বলল। 'তোমার হাতের বাঁধনটা খুলতে পারি নাকি। নিজেরটা তো নিজে পারব না।'

'কে? মুসা নাকি?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

'জিনা!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর মুসা।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসার শব্দ হলো।

'সত্যি! তোমরা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' দু'জনকেই ছুঁয়ে দেখতে লাগল জিনা।

'বিশ্বাস না হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'যে হারে সূত্র রেখে এসেছ, খুঁজে বের করতে বরং দেরিই করে ফেলেছি। আরও আগে বের করা উচিত ছিল।'

'আমাকে যে এখানে আটকে রেখেছে, কার্ডটা দেখে বুঝেছ, না?'

'বুঝলেও নিজে নিজে আসিনি। ওরাই আমাদের এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। নাও, এখন বাঁধনগুলো খোলো তো আমাদের। সব কথা পরে শুনব। তা তুমি ভাল আছ তো?'

'এ অবস্থায় কি আর ভাল থাকা যায়,' প্রথমে মুসার বাঁধনটা খুলতে শুরু করল জিনা। 'রোজ এসে একবার করে খাবার দিয়ে যায়। ফাস্ট ফুড। একই বার্গার আর ফ্রাই খেতে খেতে জিভ পচে গেছে আমার।'

চাবির রিঙে ছোট্ট একটা টর্চ আছে জিনার। সেটা কিশোরের হাতে তুলে দিল। 'ব্যাটারি প্রায় শেষ। সারাক্ষণ জ্বালালে কিছুই থাকত না। অন্ধকারেই বসে থেকেছি। দিনের পর দিন এ ভাবে থাকাটা যে কি কষ্টের!'

'পরে শুনব,' কিশোর বলল। 'এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

'আমি অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। তোমরা পারো নাকি দেখো।'

বন্ধ, জানে, তবু প্রথমে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে দেখল কিশোর।

'তাড়াতাড়ি করা দরকার,' মুসা বলল। 'গ্যাস ছেড়ে দিলে আর বেরোনো লাগবে না কোনদিন।'

'গ্যাস!' বুঝতে পারল না জিনা।

তাকে বুঝিয়ে দিল মুসা। শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জিনা। আপনাআপনি হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল যেন তার। বসে পড়ল মাটিতেই। বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে কি করে গুদামে পোকা মারা হয়, জানে সে।

কিশোর কোন কথা বলছে না। কাজে ব্যস্ত। পেনলাইটের সামান্য আলো দিয়ে ছাতের একটা গ্রিল আবিষ্কার করে ফেলল।

'ওদিক দিয়ে বাতাস আসে,' মুসার দিকে ঘুরে তাকাল সে। 'মুসা, এসো তো এখানে। তোমার কাঁধে চড়ে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

গ্রিলটার নিচে এসে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে চড়ল কিশোর। জিনা মুসাকে এমন করে ধরে রাখল, যাতে সে ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিশোরের কাজে ব্যাঘাত না হয়।

জিনার কী-রিঙটা আলো ছাড়াও আরও নানা ভাবে সাহায্য করল। একটা চাবি দিয়ে গ্রিলের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল কিশোর। ঠেলা দিয়ে সরাতে গিয়ে বুঝল, কেবিনের ওপরও ভারী জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। গ্রিলের কিনারে চেপে বসেছে ওগুলো।

'রাজ্যের যত জিনিস চাপিয়ে দিয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। হাত ওপর দিকে তুলে রাখতে রাখতে পেশীতে ব্যথা শুরু হয়েছে।

'পারছ না?' ওপর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। কিশোরের ভার বইতে বইতে সে-ও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।

'সরাতেই হবে,' কিশোর বলল। 'বেরোনোর এটাই একমাত্র পথ।'

'কিসের শব্দ!' উদ্বিগ্ন শোনাল জিনার কণ্ঠ।

'খবরদার, শ্বাস নেবে না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে!'

দুই হাতে প্রাণপণে গ্রিলটা ধরে ঠেলতে লাগল সে। তার চাপে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মুসা। কিন্তু সরল না।

নড়তে শুরু করল অবশেষে গ্রিলটা। শেষ বারের মত জোরে ঠেলা মেরে পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। দুড়ুম-দাড়ুম করে কি সব যেন পড়ল কেবিনের ছাত থেকে গড়িয়ে।

গ্রিলের ফোকরের দুই প্রান্ত চেপে ধরে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল সে। মাথাটা ঢুকিয়ে দিল ফোকরের ভেতর দিয়ে। ফোকর গলে উঠে এল ওপরে। ছাতে উঠে বসল।

দম বন্ধ করে রেখেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের কিনারে চলে এল সে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।

দরজার ডাণ্ডাটায় তালা দেয়া না থাকলেই হয় এখন। তালা থাকলে খুলতে পারবে না। বের করে আনতে পারবে না মুসা আর জিনাকে।

কতক্ষণ আর দম আটকাবে? শ্বাস টানল। ভয়ানক বিষাক্ত, তীব্র ঝাঁজাল গ্যাস মেশানো বাতাস ঢুকে গেল নাক দিয়ে। জ্বালা করে উঠল কণ্ঠনালী। ফুসফুসে চাপ অনুভব করল।

দৌড় দিল দরজাটার দিকে।

টর্চের সামান্য আলো ব্যবহার করে দেখল, তালা নেই।

দ্রুতহাতে ডাণ্ডাটা সরিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

'জিনা! মুসা!' ডাক দিল সে।

হাঁসফাঁস করছে ওরা দু'জনে। জিনার গোঙানি শোনা গেল। ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে মুসা কি বলল, বোঝা গেল না।

'শ্বাস নিচ্ছ কেন?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জলদি বেরিয়ে এসো!'

বলল বটে, কিন্তু সে নিজেই আর দম না টেনে থাকতে পারবে না। গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়ে গেছে। আগুন ধরে গেছে যেন ফুসফুসে। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার শক্তি হারাচ্ছে। কি করবে?

ইচ্ছে করছে মাটিতে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে!

চোদ্দ

গ্যাসের শিকার হওয়া চলবে না এখন কোনমতে!

নিজেকে বোঝাল কিশোর।

কোন একটা অস্ত্রের জন্যে মরিয়া হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। টর্চের আলো এত কমে গেছে যে, যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে। তার আগেই খুঁজে বের

করতে হবে কিছু একটা।

কেবিনের সামান্য দূরে একটা বেঞ্চ দেখতে পেল। ওঅর্কবেঞ্চ। তাতে দু'চারটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। শাবল, হাতুড়ি, এ সব।

কিন্তু আসল জিনিসটা কই?

যেটা খুঁজছে সে?

দেখতে পেল। দুলে উঠল বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।

থাবা দিয়ে তুলে নিল মরচে পড়া ছুরিটা।

দরজার কাছে ফিরে এল। বহু কষ্টে অজ্ঞান হওয়া থেকে বিরত রাখছে নিজেকে।

ঘোলাটে লাল একটা গোল রিঙ সৃষ্টি করে জ্বলছে টর্চটা। তবে দরজাটা কোথায় আছে দেখার জন্যে যথেষ্ট।

সেদিকে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মুসা! বেরিয়ে এসো জলদি!'

সাড়া পেল না।

'মুসা!'

'এই যে!' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল তার ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠ।

জিনার শক্তি প্রায় শেষ। তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে মুসা।

বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।

তাঁবুর দরজাটা কোন্ দিকে আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুসাদেরকে আসতে বলে আন্দাজে সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।

দরজাটা পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁবুর দেয়াল ঠেকল হাতে। মরচে পড়া ছুরিটা চালাল পাগলের মত। ধার বলতে নেই। তবু চোখা মাথাটা কাজে লাগল।

যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুরির খোঁচা মারতে মারতে ফেঁড়ে ফেলল ক্যানভাসের খানিকটা জায়গা। পেছনে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মুসা!'

'এই যে আমি!'

ঠিক এই সময় নিভে গেল টর্চ।

কাজ প্রায় শেষ। আর দরকারও নেই এটার। তবে টর্চটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে কিশোরের মন। তাই ফেলতে পারল না। ভরে রাখল পকেটে।

বাইরে বেরিয়ে এল সে। তাঁবুর কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ হাঁ করে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে খেতে বাতাস টানতে লাগল।

ফুসফুস ভরে গেল সাগর থেকে আসা তাজা হাওয়ায়।

কমে আসতে লাগল জ্বলুনি। বুকের চাপ। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

পেছনে গোঙানির মত আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল মুসা আর জিনাও তার মত মাটিতে পড়ে বাতাস টানছে।

পুরো এক মিনিট পর কথা বলল জিনা, 'উহ্, নরক থেকে বেঁচে এলাম!'

'তাহলেই বোঝো, পোকামাকড়ের কত কষ্ট!' শুকনো হাসি হাসল মুসা। 'ওদেরকে যে কত ভাবে মারি আমরা!'

'জ্বালায় বলেই তো মারি,' জিনা বলল।

'আমাদের কাছে জ্বালানো মনে হয়। আসলে তো ওরা বাঁচতে চায়, খাবার

খেতে চায়। আমাদের যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে মোটেও করে না।'

উঠে বসল কিশোর। 'কথা বোলো না। কাছাকাছিই থাকতে পারে ওরা। কথা শুনলে আবার এসে ধরবে। এবার এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে কোনমতেই আর বাঁচতে না পারি।'

হামাগুড়ি দিয়ে বনের দিকে এগোল ওরা। উঠে দাঁড়ালে যদি চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে।

গাছপালার ভেতরে এসে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল বন থেকে বেরোনোর জন্যে।

বনের বাইরে বেরোতেই একটা গাড়ি চোখে পড়ল। হলুদ রঙের একটা সিডান। গায়ে বড় একটা পোকার ছবি। নিচে কোম্পানির নাম লেখা।

ভেতরে কেউ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কাছে এল ওরা। নামটা পড়ে বুঝে গেল কিশোর, গাড়িটা এখানে কেন। কয়েকটা প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেল। বলল, 'পোকা-মারা কোম্পানির গাড়ি। পেশাদার লোককে নিয়ে এসেছে ওরা। নিয়মিত বোধহয় পোকা মেরে রেখে যায় লোকটা। আমাদের তাঁবুর ভেতরে ভরে মারার কারণটা বুঝেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখানোর জন্যে। বলবে, ভুলক্রমে দুর্ঘটনায় মারা গেছি আমরা।'

'এত ঝামেলা না করে হাঙর কিংবা অ্যালিগেটরের পুলে ফেলে দিলেই কি ভাল করত না? চিহ্নও থাকত না আমাদের।'

'ওরকম কিছু করলেই বরং পুলিশের সন্দেহ বাড়ত। ওরা জানে, আমরা উধাও হয়ে গেলে সেটা নিয়ে তদন্ত হবে। আমাদের বাড়ি থেকে লোক আসবে। ডেপুটি গেকোর কথার দুই পয়সা দাম দেবে না। কারণ ঘুষখোর পুলিশটার সব কথা বলে দেবে রবিন। মিয়ামি পুলিশ যাবে তখন গাল আইল্যান্ডে। সূত্র ধরে ধরে গিয়ে হাজির হবে কেইনের বাড়িতে। সহজে ছাড়া হবে না তাকে। কোন্‌খানে তার কয়টা বাড়ি আছে বের করে ফেলবে পুলিশ। এ বাড়িটাতে আসবে। হাঙর আর অ্যালিগেটরের পুল দেখলে বুঝে যাবে আমাদের কি গতি করেছে কেইন।'

'গ্যাসের মধ্যে পড়ে মরলেও তো বুঝত।'

'না, অন্য কথা বোঝাতে পারত তখন কেইন। বলত জিনার খোঁজে আমরা গিয়ে তার তাঁবুতে ঢুকেছি। ঠিক এ সময় পোকা মারার জন্যে গ্যাস ছেড়েছে পোকা-মারা কোম্পানির লোক। আমরা যে ভেতরে আছি, জানার কথা নয় লোকটার। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলত কেইন। তিন-তিনটা খুন করেও তখন ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে থাকত সে।'

'কত্তবড় শয়তান!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'ওকে ধরে একবার হাঙর, একবার অ্যালিগেটরের পুলে যদি চুবাতে পারতাম, রাগটা কমত!'

'রাগ পরে কমিয়ো,' হাসল কিশোর। 'এখন দেখো, গাড়িটা স্টার্ট দিতে পারো নাকি। হাতের কাছে যখন পেয়েই গেছি, পালানোর জন্যে রেডি থাকি।'

দরজায় তালা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি পোকা-মারা কোম্পানির লোক।

চাবিটাও ইগনিশনেই আছে। মোচড় দিতেই গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন। স্টার্ট নেবে।

'হয়েছে, থামাও!' মুসার পাশে উঠে বসল কিশোর। কার-টেলিফোনটা টেনে নিল। ফোন করল মিয়ামি পুলিশকে।

ফোন ধরল যে ডিউটি অফিসার, তার নাম ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রাগবি ড্যাগোকে ধরতে চান? স্মাগলার এবং গ্যাংলীডার?'

সঙ্গে সঙ্গে জড়তা চলে গেল অফিসারের কণ্ঠ থেকে। 'কে বলছেন?'

'আমার নাম কিশোর পাশা। ঠিকানা দিচ্ছি, ভাল করে বুঝে নিন। এখানে এলেই আমাকে দেখতে পাবেন। শুধু রাগবি না, পুরো দলটাকেই ধরতে পারবেন।'

ঠিকানা জানা নেই কিশোরের, কিভাবে কিভাবে কোনখানে আসতে হবে বলে দিল ডিটেকটিভ ওয়ারেনকে। পেছনে খুট করে শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিল কিশোর। তার মনে হলো, আরও কিছু যেন বলতে চেয়েছিল ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কিন্তু সে-সময় আর নেই।

তাড়াতাড়ি ফোন রেখে গাড়ি থেকে নেমে এল সে।

শব্দটা যেদিক থেকে হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কাউকে আসতে দেখা গেল না। তারমানে কোন বুনো প্রাণী হবে। শেয়াল কিংবা র‍্যাকুন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'নামলে কেন? চলো, বেরিয়ে যাই।'

'বেরোবে কি করে? গেট তো খোলে রিমোট কন্ট্রোলে।'

'গুঁতো মেরে ভেঙে ফেলব।'

'আমার মনে হয় না ভাঙতে পারবে। কেইন সিনেমা দেখেনি, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারবে না। গাড়ি নিয়ে যে হরহামেশা গেট ভেঙে বেরিয়ে যায় হিরোরা, এটা তার অজানা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে না ভাঙা যায় সে-ভাবেই তৈরি করা হয়েছে গেটটা।'

'তাহলে কি করব? বসে থাকলে তো ধরা পড়ে যাব।'

'দেখি, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করি। পুলিশকে কাছে আসার সময় দিই। আমাদের এদিকে শত্রুপক্ষের কাউকে আসতে দেখলে কেটে পড়ব। যদি না আসে, কয়েক মিনিট পর অ্যাকশনে যাব। শুধু পুলিশের আশায় বসে থাকলে হবে না। আমাদেরও প্রচুর কাজ আছে। কেইন আর ড্যাগোকে হাতে যখন পেয়েছি, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। নেমে এসো। লুকিয়ে থাকি।'

গাড়ির কাছেই ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল তিনজনে।

'হ্যাঁ, এবার বলো তো,' জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ধরল কি করে ওরা তোমাকে?'

'সামনে দিয়ে এসে গাড়িটার পথরোধ করল,' জিনা বলল। 'তারপর এনডি আর কোরি নেমে এসে পিস্তল দেখিয়ে ধরে নিয়ে গেল আমাকে।'

'হারম্যান কেগ ছিল না ওদের সঙ্গে?'

'এই কেগটা আবার কে?'

'বুঝলাম। তারমানে চেনো না একে। কেন তোমাকে কিডন্যাপ করল সেই

কথাটা বলো দেখি আগে।'

'জেরি আঙ্কেলের ডকটা ভাঙার সময় এনডিকে দেখে ফেলেছিলাম আমি,' জিনা বলল। 'বোটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে। বোট চালাচ্ছিল আরেকটা লোক। পরে আর কখনও দেখিনি তাকে। এনডিকে যে দেখেছি, সেটা বুঝে ফেলেছিল সে। পরের দিন যখন সৈকতে গেলাম, আবার তাকে দেখতে পেলাম কেইনের বাড়িতে। কোরির সঙ্গে ধরাধরি করে একটা বোট থেকে মাল নামাচ্ছিল। বাক্সের গায়ে বার্মিজ লেখা। আমাকে এনডির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল এনডি।'

'কেন তোমাকে কিডন্যাপ করা হলো, সেটা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের খোঁজ পেল কি করে ওরা? ফ্লোরিডা থেকেই আমাদের পিছে লেগেছিল। গাড়ির চাকা কেটে দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছে।'

'সেটা আমারই বোকামির জন্যে,' চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল জিনা। 'আমাকে যখন ধরে নিয়ে গেল ওরা, কেইনের সামনে হাজির করল, তাকে হুমকি দিয়েছিলাম। তোমাদের নাম করে বলেছিলাম, তোমরা আমাদের বন্ধু। আমার নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনলে অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করতে আসবে তোমরা। সে-কারণেই নিশ্চয় সাবধান হয়ে গিয়েছিল ওরা। তোমাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তোমরা বিপজ্জনক। সে-জন্যে গাল আইল্যান্ডে ঢোকার আগেই তোমাদের বিদায় করতে চেয়েছিল।'

'হুঁ,' চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'কেগকে চেনো না,' মুসা বলল, 'কিন্তু তার বাড়িতে তোমার ঘড়ি পাওয়া গেল কিভাবে?'

'কেগের বাড়িতে আমার ঘড়ি! আমি তো ভেবেছিলাম ঘড়িটা আমি কেইনের বাড়িতে ফেলে এসেছি। কেগকে আমি চিনিই না...'

'আমি বুঝে গেছি,' কিশোর বলল। 'তোমার কিডন্যাপিঙের দায় অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা বেঁচে যেতে চেয়েছিল। এর জন্যে কেগের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে? করে বীমার দালালি, অথচ গাল আইল্যান্ডে এসে সময় কাটাচ্ছে পচা পচা ছবি এঁকে। চালচলন রহস্যময়। স্থানীয় লোকও নয় সে। মিয়ামি থেকে পুলিশ এসে তদন্ত চালালে ঘুষখোর গেকোটার সাহায্যে সহজেই তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারত। সে-জন্যে ফাঁদ তৈরিও করে রেখেছিল ওরা। কেগের গাড়িটা চুরি করে সেটার সাহায্যে তোমাকে কিডন্যাপ করে, তোমার ঘড়ি নিয়ে ফেলে রেখে আসে তার বাড়ির টেবিলে। তোমার ছবি থেকে তার গাড়ির নম্বর বের করে আমরাও তো তাকে সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছিলাম।'

'কেইনটা আসলেই পাজি!' মুসা বলল। 'আমরা যখন প্রথম ঢুকলাম তার বাড়িতে, এমন ভঙ্গি করল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।'

'ফ্রিজের দরজায় আটকানো বাবার ছবিটা পেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'রাখলে কখন?'

'আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কেইনের সঙ্গে যখন চেঁচামেচি করছি আমি, নীরা লেভিন নামে একটা বেটি এসে ঘরে ঢুকল। এনডিকে আমার পাহারায় রেখে

মেয়েলোকটাকে বের করে দিয়ে আসতে গেল কেইন। পানি খাওয়ার ছুতোয় ফ্রিজের কাছে গিয়ে তখন চুম্বকের সাহায্যে আটকে দিয়ে এলাম ছবিটা।'

'ভালই করেছিলে,' মুসা বলল। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কার্ডটা পাঠালে কি করে?'

'এ বাড়ি থেকেই জোগাড় করেছিলাম ওটা,' জিনা জানাল। 'দোতলার একটা অফিস ঘরে সামান্য সময়ের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। টেবিলে রাখা মিয়ামির সমুদ্রপাড়ের ছবিওয়ালা কার্ডটা দেখেই ফন্দি এল মাথায়। বোকা পিকোটাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করলাম ওটা। একটা কলমও চুরি করলাম। বাথরুমে গিয়ে লিখলাম। দরজা দিয়ে বের করে আমাকে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার সময় দরজার পাশের ডাকবাক্সে ফেলে দিলাম, যেটা থেকে পিয়ন এসে চিঠি নিয়ে যায় পোস্ট করার জন্যে। রাতের বেলা ছিল বলেই এত কাজ করতে পেরেছি, দিনে হলে পারতাম না।'

'তার জন্যে বোকা পিকোটাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার,' মুসা বলল।

জবাব দিতে যাচ্ছিল জিনা, দূর থেকে আসা সাইরেনের শব্দ শুনে থেমে গেল।

সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'চলো, সময় হয়েছে।'

'পোকা-মারারা তো এল না,' মুসা বলল। 'এনডি আর কোরিরও দেখা নেই।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'খুব বেশিক্ষণ তো হয়নি। আমরা মরেছি কিনা, একেবারে শিওর হয়ে তারপর আসবে ওরা।'

গেটের দিকে ছুটল তিনজনে।

হেলিকপ্টারটা চোখে পড়তে থেমে গেল কিশোর। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক কাজ করা যাক। অকেজো করে দিয়ে আসতে হবে ওটাকে, যাতে স্টার্ট না নেয়। পালাতে না পারে কেইন।'

'ঠিক। আমি যাচ্ছি।' হেলিকপ্টারের দিকে দৌড় দিল মুসা।

'বাকি থাকল বোটটা,' ছুটতে ছুটতে জিনাকে বলল কিশোর। 'গাড়িতে করে পালাতে গেলে পুলিশের সামনে পড়ে যাবে ওরা। বেরোতে পারবে না। আমি বোটটার ব্যবস্থা করে আসি। তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো। খবরদার, কোনমতেই ওদের হাতে পোড়ো না আর। তাহলে তোমাকে ব্যবহার করে পালানোর ব্যবস্থা করে নেবে ওরা।'

ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সামনে সমুদ্র। বোটহাউসটা দেখা যাচ্ছে। সাগর থেকে একটা চওড়া চ্যানেল বেরিয়ে এসেছে। সেটার মুখেই বানানো হয়েছে বোটহাউসটা। বোটহাউসের বাইরে নোঙর করে রেখেছে একটা বোট। ইয়টটা রয়েছে খোলা সমুদ্রে। ওটাতে যেতে চাইলে বোটে করে যেতে হবে। বোটটা নষ্ট করে দিলেই যাওয়ার উপায় থাকবে না আর।

পানির কিনারে এসে জুতো খুলে ফেলল কিশোর। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল

পানিতে। সাঁতরে এগোল বোটের দিকে।

কিশোরের কথা অমান্য করল না জিনা। কোন ঝুঁকি নিতে গেল না। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। একটা দুটো করে পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

এগিয়ে আসছে সাইরেনের শব্দ।

সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল হঠাৎ পিকো। দৌড় দিল ড্রাইভওয়ে ধরে। কিছুটা এগিয়ে রিমোট কন্ট্রোল তুলে সুইচ টিপে গেটটা খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে গেল জিনা। পুলিশকে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে নাকি লোকটা?

বুঝল পরক্ষণেই। খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল পিকো। পুলিশের আসার সঙ্কেত পেয়েই পালাচ্ছে ভীতু লোকটা।

সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল আরও তিনজন। ডগলাস কেইন, রাগবি ড্যাগো আর নীরা লেভিন। খোলা গেটের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল ওরা। কি যেন বলল কেইন। শব্দ শুনলেও এত দূর থেকে কথাগুলো বুঝতে পারল না জিনা। নিশ্চয় পিকোকে গালাগাল করছে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত তুলে হেলিকপ্টারটার দিকে দেখাতে লাগল কেইন। রাগবি দেখাতে লাগল পানির দিকে। বোঝা গেল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওরা, কোন পথে পালাবে। কেইন বলছে হেলিকপ্টারে করে যেতে, ড্যাগো বলছে বোটে করে। শেষমেষ হেলিকপ্টারের দিকেই ছুটল ওরা।

মুচকি হাসল জিনা। মনে মনে বলল, যাও, দেখোগে ওড়াতে পারো কিনা! একবার মুসার হাত পড়লে তোমাদের বাপেরও সাধ্য নেই ওটা আর এত তাড়াতাড়ি ওড়াতে পারো।

পেছনে হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল জিনা। এনডি আর কোরি দৌড়ে আসছে। ভীষণ উত্তেজিত। কেন, সেটাও অনুমান করতে পারল সে। নিশ্চয় কেবিনে ঢুকে ওদেরকে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গেছে ওরা। বসকে খবরটা দিতে আসছে। কিন্তু সাইরেনের শব্দ শুনে আর বস্‌দেরকে হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়াতে দেখে থমকে গেল ওরা। বুঝল, পরিস্থিতি সুবিধের নয়।

যেতে যেতে চিৎকার করে আদেশ দিল কেইন, 'ওদিকে যাচ্ছ কোথায়, গাধা কোথাকার! জলদি বোট নিয়ে পালাও! ইয়টটা নিয়ে চলে যাও গাল আইল্যান্ডে। আমরা হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছি।'

পৌঁছে গেছে পুলিশ। গেট দিয়ে ঢুকল প্রথম গাড়িটা। পেছনে একে একে আরও চারটা। পুরো বহর নিয়ে চলে এসেছে ওরা। রাগবি ড্যাগোকে ধরার এমন চমৎকার মওকা কোন ভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

গাড়ি-বারান্দায় এসে ব্রেক করল সামনের গাড়িটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দু'দিকের দরজা। প্রথমেই যাকে নামতে দেখল জিনা, দেখে অবাক হয়ে গেল।

রবিন!

বুঝতে পারল না, পুলিশের সঙ্গে ও এল কি করে?

রবিনকে দেখে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না জিনা। লাফ দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল গাড়ি-বারান্দার দিকে।

দেখল, ইভাও নামছে গাড়ি থেকে। জিনা তো আর জানে না, কিশোর রবিনকে বলে এসেছে মধ্যরাতের পর ওরা মোটেলে ফিরে না গেলে মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ডিটেকটিভ ওয়ারেন রবিনের আসার সংবাদটাই জানাতে চেয়েছিল কিশোরকে। লাইন কেটে না দিলে ওই সময়ই রবিনের সঙ্গে কথা বলতে পারত কিশোর।

পনেরো

চব্বিশ ঘণ্টা পর নিজেদের ভাড়া করা ভ্যানটায় করে আবার গাল আইল্যান্ডে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এবার ওদের সঙ্গে রয়েছে জিনা আর ইভা। মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ সিটিঙের পর, পুরো রিপোর্ট লিখে দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল গোয়েন্দারা। পুলিশের অনুরোধে–অন্তত একটা দিন যেন থেকে যায় ওরা। ওদেরকে দরকার হতে পারে।

হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে ওদের। গাড়ি চালানোর সময় মনের আনন্দে শিস দিতে শুরু করল মুসা।

ঘুরপথে না গিয়ে অ্যালিগেটর অ্যালিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। কিশোর জিজ্ঞেস করলে বলল, 'দিনের বেলা না দেখে যাচ্ছি না আমি, সে-রাতে কাদের খাবার হতে যাচ্ছিলাম।'

'দেখো, এখন সত্যি সত্যি না খাবার হয়ে যাও,' সাবধান করল বটে কিশোর, কিন্তু আপত্তি করল না। কারণ দিনের আলোয় অ্যালিগেটরে ভরা জলাভূমিটা দেখার লোভ সামলাতে পারল না সে-ও।

রবিন আর জিনারও আগ্রহ আছে। ইভার নেই। বহুবার দেখেছে সে। তবে বাধা দিল না। কিছু বললও না। ওরা দেখতে চাইছে, দেখুক।

নিরাপদেই পেরিয়ে এল বিশাল জলাভূমিটা। কোথায় পড়তে যাচ্ছিল রাতের বেলা, দিনের আলোয় দেখে শিউরে উঠল মুসা। সত্যি ভয়ানক জায়গা! বড় বাঁচা বেঁচেছে।

কজওয়ে ধরে গাল আইল্যান্ডে যখন ঢুকছে ওরা, মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্যটা। তীব্র হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের কড়া রোদ।

গাল আইল্যান্ডে ফিরে মোটেলে ঢোকার পথেই দেখা হয়ে গেল হারম্যান কেগের সঙ্গে। সবুজ গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর।

নেমে গেল ওরা দল বেঁধে। গাড়িটা থেকে খানিক দূরে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা পাম গাছের ওপর ছাতার নিচে বসে গভীর মনোযোগে পামের জটলার ছবি

আঁকছে সে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে বালিতে খাড়া করে গেঁথে দিয়েছে বড় একটা ছাতা।

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল হাত। থেমে গেল পেন্সিল। 'তোমরা!'

'হ্যাঁ, আমরা,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'আজ আর কোন অভিযোগ নিয়ে আসিনি আপনার কাছে। আসল কিডন্যাপাররা ধরা পড়েছে।...জিনা, হারম্যান কেগ।'

মাথা নাড়ল জিনা, 'জীবনেও দেখিনি একে।'

উঠে এল কেগ। ভুরু কুঁচকে জিনাকে দেখতে লাগল।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। সংক্ষেপে জানাল সব।

'খোদা বাঁচিয়েছে আমাকে!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কেগ। 'ওর ঘড়িটা যে আমার ঘর থেকে নিয়ে গেছ, একটা কাজের কাজ করেছ। চুরি করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে বলে এক বিন্দু রাগ নেই আর আমার।'

'কিন্তু একটা কথা বলুন তো,' কিশোর বলল, 'বীমার দালালি ছেড়ে আপনি এতদিন ধরে এই গাল আইল্যান্ডে এসে বসে আছেন কেন?'

অবাক হয়ে গেল কেগ। 'আমি বীমার দালালি করি কে বলল তোমাকে?'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা গোয়েন্দা। কেইন আর ড্যাগোর মত অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়ে এলাম, আর আপনি কি কাজ করেন, সেটা বের করতে পারব না?'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কেগ। 'আর মিথ্যে বলব না। সত্যি কথাটাই বলি। বীমার দালালি আমার পেশা নয়। আমি এ লাইনে নতুন। মানুষকে পলিসি গছানো যে কি কঠিন ব্যাপার, যে এ কাজ না করেছে সে বুঝবে না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে যা-ও বা একজনকে রাজি করালাম, এমন একটা প্যাঁচে ফেলে দিল আমাকে যে, পারলে কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে পুলিশে দেয়। কিছুটা সেই ভয়ে, আর মনের দুঃখে এসে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি।'

'পচা পচা ছবি আঁকার জন্যে,' হাসল মুসা। গলা লম্বা করে কেগের হাতের ছবিটা দেখল। 'এগুলো কি পামের জটলা, না মুঠি বাঁধা ছাগলের শিং? শিঙের মাথায় ওগুলো কি? তুলোর পোঁটলা?'

স্তব্ধ হয়ে গেল কেগ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল গম্ভীর মুখে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'ঠিক বলেছ। আমি জানি আমার আঁকা ভাল হয় না। কিন্তু এত সহজে সত্যি কথাটা আমার মুখের ওপর কেউ বলেনি আর। শুধু এ কথাটার জন্যে তোমাদেরকে একটা দাওয়াত দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

'খাওয়ার দাওয়াত তো?' সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা লুফে নিল মুসা। 'বলুন, কবে আসতে হবে?'

কেগকে ধন্যবাদ দিয়ে, হাসাহাসি করতে করতে গাড়িতে ফিরে এল ওরা।

মোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গাড়ির শব্দ শুনে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ব্রুক। গাড়ির কাছে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এসেছ তোমরা! বাঁচা গেল। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম...'

'হ্যাঁ, চাচা,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে জবাব দিল ইভা। 'অ্যালিগেটর

অ্যালিতে থেমেছিলাম। জলাভূমিটা দেখতে চেয়েছিল ওরা।'

'অ। টেলিফোনে সব শুনেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'মনে হচ্ছিল, ড্যাগো আর কেইন সহ ধরা তো পড়েছে মাত্র চার-পাঁচজন। কিন্তু ওদের দলে আরও লোক আছে নিশ্চয়। যারা তখন ওবাড়িটাতে ছিল না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রাস্তায় যদি কিছু করে তোদের?'

'কিছু যে করেনি, দেখতেই তো পাচ্ছ,' হেসে বলল ইভা।

ড্রাইভিং সীট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল মুসা। 'কিন্তু কথাটা হলো আঙ্কেল, আপনার দুশ্চিন্তা কমেছে, কিন্তু আমার যে বেড়ে যাচ্ছে।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। ইভাও অবাক।

'কেন, এখন আর দুশ্চিন্তা কিসের?' জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক। 'সব ঝামেলা তো শেষ।'

'দুশ্চিন্তাটা হলো, কেউ খাওয়ার কথা বলছে না,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। 'নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেলে কোন মানুষ বাঁচে বলে আমার জানা নেই।'

হা-হা করে হেসে উঠলেন আঙ্কেল ব্রুক।

চমকে গেল ইভা। চাচাকে এ ভাবে হাসতে বহুকাল দেখেনি।

হাসতে হাসতে মিস্টার ব্রুক বললেন, 'ভাল কথা মনে করেছ তো। তোমাদের অপেক্ষায় থেকে থেকে পেট বলে যে একটা জিনিস আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো চলো, কুপারের ওখানেই গিয়ে খাওয়াটা সেরে আসি। আমরা যে বিজয়ী হয়েছি, লাঞ্চ দিয়ে সেটা সেলিব্রেট করব।'

'তা-ই চলুন। মিস্টার কুপারকেও জানাতে পারব, তার রেস্টুরেন্টটা বেঁচে গেছে। কেইনের শয়তানি বন্ধ হয়েছে। আবার আসবে ট্যুরিস্ট, জমে উঠবে ব্যবসা।'

'সেটা জানে না মনে করেছ? সুখবরটা অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'আরও একবার জানাব আমরা, চলুন।'

আবার গাড়িতে উঠল সবাই। দলে এবার যুক্ত হলেন মিস্টার ব্রুক।

কুপার'স ডিনারের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে সারি দিয়ে ভেতরে ঢুকল সবাই। তাড়াহুড়ো করে চেয়ার টানাটানি করে এনে টেবিল গুছিয়ে দিল কুপার আর ম্যাগি। আরাম করে বসল সবাই। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বিরাট এক ট্রে বোঝাই করে বার্গার আর স্টেক স্যান্ডউইচ নিয়ে হাজির হলো ম্যাগি।

'কেইনের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ,' খেতে খেতে গোয়েন্দাদের জানালেন মিস্টার ব্রুক। 'নানা রকম দামী দামী চোরাই মালে ভর্তি ছিল বাড়ির নিচতলার স্টোররুম। বড় বড় মার্কেটের দোকান থেকে চুরি গেছে ওসব। লিস্ট আছে মিয়ামি পুলিশের কাছে। সেই সঙ্গে চোরাই পথে আনা প্রচুর ইলেকট্রনিক সামগ্রী, বিশেষ করে কম্পিউটারের পার্টস, বেআইনী ভাবে আনা। গ্যাংলীডার রাগবি ড্যাগো দক্ষিণ ফ্লোরিডাতেও তার ব্যবসা বিস্তার করতে চেয়েছিল। দলে ঢুকিয়ে নিয়েছিল স্মাগলার কেইনকে।'

'খালাস পেয়ে যাবে না তো?' প্রশ্ন করল জিনা।

'না, তা পাবে না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার ব্রুক। 'প্রথমেই আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলল, না, ওর বিরুদ্ধে এত বেশি প্রমাণ আছে ওদের হাতে, কোনমতেই ছাড়া পাবে না কেইন। আর ড্যাগো তো আগে থেকেই অভিযুক্ত হয়ে আছে।' মুখ তুললেন মিস্টার ব্রুক। 'আমাদের দ্বীপ থেকে কেন তাড়াতে চেয়েছিল ওরা, বলেছে কিছু?'

'কেইন আর ড্যাগো অন্তত আমাদের সামনে মুখ খোলেনি,' কিশোর বলল। 'পরে কি করবে জানি না। তবে নীরা বেগম জেরার মুখে ক্যানারি পাখির মত গান গাওয়া শুরু করেছিল। আর পিকোটাকেও ধরে ফেলেছে পুলিশ। সে তো এমন কাণ্ড করল, যেন পেটে যা আছে উগরে দিতে পারলে বাঁচে।'

'পিকো কে?'

'কেইনের বিসকেইনি বে'র বাড়ির পাহারাদার।'

'ও। তা কি বলল?'

'পুরো দ্বীপটাই কিনে ফেলতে চেয়েছিল কেইন,' ছুরি দিয়ে স্টেক কেটে কাঁটা চামচে গেঁথে মুখে পুরল কিশোর। 'ওদের হেডকোয়ার্টার বানাতে চেয়েছিল। চোর-ডাকাত স্মাগলারদের স্বর্গদ্বীপ। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে সুন্দর, ছিমছাম, নিরিবিলি একটা দ্বীপের চেয়ে ভাল হেডকোয়ার্টার ওদের মত অপরাধীরা আর কোথায় পাবে? স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ, সব দিক থেকে ঢোকা যায়।'

'হুঁ, তা ঠিক। আমার গাছগুলো কে চুরি করেছে, বলেছে নাকি?' জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক।

'ওই দুই শয়তানই লোক দিয়ে করিয়েছে,' কিশোর জানাল। 'এনডি আর কোরি। আপনি যে ভেবেছেন বিক্রির জন্যে নিয়ে গেছে, তা না; আসলে বিরক্ত করে করে আপনাকে বিদেয় করার জন্যে।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে এখন,' মাথা দোলালেন মিস্টার ব্রুক। 'আর টাকা খেয়ে ওদের সহায়তা করে এসেছে শয়তান গেকোটা।'

'তাই তো, গিরগিটিটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' খেতে খেতে মুখ তুলল মুসা। 'ওটার কি গতি করেছে মিয়ামি পুলিশ? নারকেল গাছে তুলে দিয়ে গেছে, যেখানে ওর আসল বাসা?'

হাসলেন মিস্টার ব্রুক। 'না, নারকেল গাছে তোলেনি। তবে শাসিয়ে দিয়ে গেছে, দ্বীপের কারও ব্যাপারে যেন আর নাক না গলায়। ওর জায়গায় একজন অফিসারকে বসিয়ে গেছে অস্থায়ী ভাবে দ্বীপে পুলিশের দায়িত্ব পালনের জন্যে। বলে গেছে যত শীঘ্রি পারে কাউন্টিতে নালিশ করে ওর ডেপুটিগিরি খতম করে ওকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করবে।'

'মজার ব্যাপারটা কি জানেন?' আবার আগের কথায় ফিরে এল কিশোর। 'নীরা লেভিন কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকেও জানত না কেইনের আসল ব্যবসাটা কিসের। তাকে বলা হয়েছিল এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা আছে কেইনের। সে একজন বিরাট বড়লোকের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। সে-জন্যেই পুরো দ্বীপটা কিনে নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে আসছিল কেইনকে। একটু-আধটু অপরাধ করে ফেলেছিল।'

'বহু জায়গা এখন খালি পড়ে আছে দ্বীপে,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'সব নীরার কেনা, তার নিজের নামে। অনেকেই তার কাছে জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে। অনেকে বাড়িঘরের কাজ শুরু করেছিল মাত্র, তাদের জায়গাও কিনে নিয়েছে নীরা।'

'তার অত সাধের কেইন তো গেছে চোদ্দ শিকের আড়ালে,' মুসা বলল। 'এখন এসে ওসব জায়গা ভোগ করুক। ইচ্ছে করলে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে পারে।'

'যদি সে-ও বেরোতে পারে শিকের আড়াল থেকে,' ফোড়ন কাটল রবিন।

'তা পারতেও পারে,' কিশোর বলল। 'যে রকম খেপেছে কেইনের ওপর, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও দ্বিধা করবে না। তার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে তখন তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেয়া হবে জেল থেকে।'

'তা তো হলো,' জিনা বলল। 'কিন্তু আমরা এখন কি করব? বাড়ি ফিরে যাব?'

'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিছুই দেখা হলো না এখানকার সমুদ্র। শুনেছি, পুরানো আমলে আশেপাশে প্রচুর জাহাজডুবী হয়েছে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে দিয়ে গুপ্তধন খুঁজব। তা ছাড়া কেগের দাওয়াতটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? না খেয়ে চলে গেলে নিরাশ হবে না ভদ্রলোক?'

-: শেষ :-